Journal of Gono Bishwabidyalay
Vol.4 Issue:1
January 2023

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের বৈজ্ঞানিক দর্শন এবং *বিজ্ঞান রহস্য* পর্যালোচনা

আতি-উন-নাহার*[১]

সার সংক্ষেপ

বাংলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। আর এই শতাব্দীতেই বাংলা গদ্য প্রবন্ধ রচনার উপযুক্ত বাহন হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক রচয়িতা হিসেবেই অধিক পরিচিত। সাহিত্যিক প্রতিভার পাশাপাশি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক সত্তার পরিচয়ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবন্ধ রচনার ধারায় বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি ইতিহাস, নৃ-বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ধর্মতত্ত্ব এবং সমকালীন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে (জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান) প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়কে জনপ্রিয় করে তোলেন। তৎকালীন ভারতবর্ষে বঙ্কিম অনুভব করেছিলেন ইউরোপীয় বিজ্ঞানের দ্বারাই ব্রিটিশরা রাজত্ব করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের চেতনায় বিজ্ঞান মনস্ক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন তিনি। সমাজ সংস্কার ছিল এই যুগের প্রধান লক্ষ্য। প্রবন্ধ সাহিত্যই সেই যুগের সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনের প্রধান অবলম্বন ছিল (দে, ১৩৬৬)[১৪]। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষীয় জনগোষ্ঠীকে আলোর পথ দেখান তিনি। এসময় তাঁর অনুসরণে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ঘটনা দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বাঙালি লেখকেরা ক্রমাগত মানব চেতনার উন্নয়নে লেখা শুরু করেন। তাঁরা বিচিত্র বিষয়ে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার কাজে লেখনী ধারণ করেন। আর এই পথের অগ্রদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে আধুনিক চেতনায় সমৃদ্ধ করার চেষ্টায় তিনি রচনা করেন ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ গ্রন্থ *বিজ্ঞান রহস্য* (১৮৭৫)[২০] অর্থাৎ *বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসংগ্রহ*। বর্তমান প্রবন্ধে বঙ্কিমের প্রাবন্ধিক সত্তাকে অধিক গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক দর্শন ও তাঁর 'বিজ্ঞানরহস্য' গ্রন্থের পর্যালোচনা নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতির প্রাথমিক উৎস হিসেবে উক্ত গ্রন্থের ৯টি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও গবেষণার দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে বঙ্কিম সাহিত্য নিয়ে বিভিন্ন সমালোচনা গ্রন্থ, গবেষণা প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও সাময়িকীতে পর্যালোচিত ও আলোচিত বিষয় ব্যবহার করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নির্ভর প্রবন্ধটিতে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ, সূর্যের গঠনপ্রকৃতি, তারকামন্ডলীর অবস্থান, পৃথিবীর ধূলিকণা, মহাবিশ্বের গতি, মানবজাতির জন্ম ও বিবর্তন, প্রাণের রহস্য, পরিমাপ ও পরিমাণ রহস্য এবং চন্দ্রপৃষ্ঠের বর্ণনা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের তথ্য, যুক্তি, প্রমাণসহ তিনি বিস্তারিত উপস্থাপন করেছেন। ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও সনাতন হিন্দু চিন্তাধারার বিরোধের মধ্যে বঙ্কিমের দার্শনিক চিন্তা, মন ও শিল্প বিবর্তনের স্বরূপ বর্তমান গবেষণায় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে (পোদ্দার, ২০১৩)[১৬]। সবশেষে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলগুলো- ঊনিশ শতকের প্রবন্ধ রচনার প্রেক্ষাপট, বঙ্কিমের দার্শনিক চিন্তার বিবর্তন, বিজ্ঞান শিক্ষায় বঙ্কিমের প্রবন্ধের গুরুত্ব, ভারতবর্ষীয় সমাজে কুসংস্কার দূরীকরণে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক, সাহিত্যে বিজ্ঞানচর্চার সুফল, নতুন গবেষকদের বিজ্ঞানচর্চা ও পাঠে উদ্বুদ্ধকরণ, শিক্ষিত মহল ও পাঠকসমাজের উপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রভাব ও বঙ্কিম সম্পর্কে পাঠকের প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

মূল বিষয়সূচক শব্দ: দিগদর্শন, বঙ্গদর্শন, বিজ্ঞান রহস্য, বিজ্ঞান দর্শন, ফসিল, সৌরোৎপাত, জৈবনিক, জ্যোতিস্তরঙ্গ, বিশ্লেষণ, অম্লজান, পর্যালোচনা।

---

[1] সিনিয়ার প্রভাষক, ভাষা যোগাযোগ ও সংস্কৃতি বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪।
* Corresponding Authors email: atiunnahar@gmail.com Phone: 01759246371.

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

ভূমিকা

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাস দুশো বছরের। ঊনবিংশ শতকে বাংলা সাহিত্য আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। বাংলা গদ্যের বিকাশ ও পরিণতি এই শতকেই। আধুনিক শিক্ষার প্রসার, স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাহিত্যবোধ ও মননের উন্নয়ন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের প্রতিষ্ঠা, সুগভীর সুচিন্তিত আধ্যাত্মিক মানসিকতা ও প্রবল বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ- এ সমস্তকিছুর সূচনা এবং পরিণতি সবই সম্ভব হয়েছিল এই শতকে। এ সময় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নব নব সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। সমাচার দর্পণ, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ১৮৪৩ এ প্রকাশিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপন, ১৮৩৫ সালে বৃটিশ কর্তৃক ইংরেজিকে সরকারি ভাষা নির্ধারণ, ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাঙালি জাতির পুনর্জন্ম লাভে ভূমিকা রেখেছে (চৌধুরী, ২০১৫)[৫]। নবজাগরণের ফলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষীয় বাঙালি সমাজকে আলোর পথ দেখান রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলা গদ্যের পথ তৈরি করেছিলেন তাঁরা। এই শতকেই বাংলা সাহিত্য বিকাশের পর্যায়ে উপনীত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে এসে বাঙালির চিন্তায় উৎকর্ষ দেখা দেয় (দে, ১৩৬৬)[১৪]। সাহিত্যাকাশে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) আগমনের পূর্বেই বাংলায় নবজাগরণ ঘটেছিল। সাহিত্যেও নবজাগরণের প্রভাব পড়েছিল। প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সমাজ সংস্কারে প্রবন্ধের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। কিশোর বয়সে বঙ্কিম প্রথম কবিতা রচনা করেন 'বিরলে বাস'(১৮৫২)(দ্রষ্টব্য:ভট্টাচার্য,১৯৭৮)[২৪] নামে যা প্রথম সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে কাব্যচর্চা ছেড়ে গদ্যচর্চায় মনোযোগী হন তিনি। নিজেকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, দার্শনিক ও প্রাবন্ধিক প্রতিভা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্কিমের সমসাময়িক গিরিষচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সকলেই পাশ্চাত্য মনীষী অগাস্ত কোঁৎ এর ধ্রুবদর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। বঙ্কিম কোঁৎ, মিল, বেন্থাম, লক, হ্যামিলটন, স্টুয়ার্ট মিল, স্পেন্সার দার্শনিকদের মতবাদ পড়ে সমৃদ্ধ হয়েছেন। ব্যক্তিবোধ, সমাজবোধ, স্বদেশবোধ, আন্তর্জাতিকতার প্রতি আগ্রহ এসব কিছুর সমন্বয় বঙ্কিমের মধ্যে দেখা যায়। বঙ্কিম সাহিত্য সৃষ্টির পথকে সমৃদ্ধ করেছেন যুক্তি, তথ্য, তর্ক, তত্ত্ব সব কিছুর দ্বারা। বঙ্কিম রচিত সাহিত্য ভান্ডারের রয়েছে বিচিত্র বিভাজন। উপন্যাস, রম্যরচনা, সমালোচনা, বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা উল্লেখযোগ্য। প্রথম জীবনের অক্ষম কবিত্ব থেকে শুরু করে শেষ জীবনের তত্ত্বালোচনা অবধি এক ঐতিহাসিক গুরুত্ব দাবী করে বিপুল বিস্তৃত বঙ্কিম সাহিত্য। ঔপন্যাসিক সত্তার পাশাপাশি সাহিত্যিক বঙ্কিমের প্রাবন্ধিক সত্তা অনেক ক্ষেত্রেই আজ উপেক্ষিত। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের বিজ্ঞান মনস্কতা, তার বিবর্তনবাদী দার্শনিক চিন্তা তথা- বস্তুবাদী ও ভক্তিবাদী মানসিকতার পরিচয়, প্রথম জীবনের সূক্ষ্ম ও গভীর চিন্তামূলক বিজ্ঞানালোচনা, ভারতের উন্নতির জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের সাধনা, লেখক হিসেবে রসাত্মক মনোভাবের পরিচয় ও বিশ্লেষণাত্মক উপস্থাপন, সর্বোপরি পাঠকের মূল্যায়ন - এ সমুদয় বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

২. তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য পর্যালোচনা

সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম প্রবন্ধ। প্রবন্ধের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন বিভিন্ন মনীষী। আমরা জানি প্রকৃষ্ট বন্ধনজাত রচনামাত্রই প্রবন্ধ। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবন্ধ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত রচনার পশ্চাতে বিবিধ অর্থ পরিলক্ষিত হয়েছে। ছন্দোগত বন্ধন, বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু সম্বন্ধরূপ বন্ধন, সর্গ-পর্ব-অধ্যায়াদির বন্ধন, রচনাক্রমের ধারাবাহিক পারম্পর্যরূপ বন্ধন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের বন্ধন সমন্বিত গদ্য-পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই সংস্কৃতে 'প্রবন্ধ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ফরাসি `essai' থেকে ইংরেজিতে

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

এসেছে শব্দটি। 'Essai' শব্দর অর্থ হল 'ধাতু' প্রভৃতির গুণাগুণ নির্ণয় করার ক্রিয়াকৌশল। ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসি নবজাগরণের অন্যতম প্রধান লেখক Michael de Montaigne (1533-1592) ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম প্রবন্ধ রচনাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনি একজন রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁকে আধুনিক সংশয়বাদের জনক বলা হয়ে থাকে। তিনি আত্মভাবপ্রধান গদ্যরচনাকে 'Essais' নামে অভিহিত করেন (Montaigne,1892)[57]। অপর এক পাশ্চাত্য সমালোচক M.H. Abrams (1970)[45] তাঁর *A Glossary of literary terms* গ্রন্থে 'Essay' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখেন- 'any brief composition in prose that undertakes to discuss a matter, express a point of view, or persuade us to accept a thesis on any subject whatever.The essay differ from a treatise or dissertation and in being addressed to a general rather than a specialized audience; as a consequence, the essay discusses its subject in non-technical fashion, and often with a liberal use of such devices as anecdote striking illustration and humour to arugment its appeal.'

ইংরেজ সমালোচক Hugh Walker (1915)[62] `Essay' শব্দের ব্যাখ্যা প্রদান করেন- `while therefore we know fairly well what to expect of a poem called a lyric and even of one called an epic or a tragedy, we have hardly the vaguest idea of that we shall find in a composition entitled an essay.'

Cuddon (1977)[46] সাহিত্য অভিধানে ব্যাখ্যা প্রদান করেন- `A composition, usually in prose, which may be of only a few hundred words or of book length and which discusses, formally or informally, a topic or a variety of topics. It is one of the most flexible and adoptable of all literary forms.'

তবে Eassy আর প্রবন্ধ এক অর্থে ব্যবহৃত হওয়া সমীচীন নয়। লেখকের মনন মেধা চিন্তন কল্পনাপ্রসূত একটা গবেষণাধর্মী রচনাকে প্রবন্ধ বলা যুক্তিযুক্ত। এই ধরণের ভাষা বা ডিসকোর্স ব্যক্তিধর্মী হতে পারে আবার বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে। ডিসকোর্স শব্দটিকে Cuddon (1977)[46] ব্যাখ্যা করেছেন- `Usually a learned discussion spoken or written on a philosophical, political, literary or religious topic. It is closely related to a treatese and a dissertation. In fact the three terms are very nearly synonymus.'

ইংরেজি সাহিত্যের বিশ শতকের অন্যতম প্রভাবশালী প্রাবন্ধিক Robert Wilson Lynd (1952)[55] প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে.বলেন,`Sometimes it is nearly a sermon. Sometimes it is nearly short story. It may be a fragrant of autobiography, of a piece of nonsense. It may be satirical or vitupera live or sentimental. It may deal with any subject from the day of judgement to a pair of scissors.'

অপরদিকে বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ সম্পর্কে শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৩৬৭)[১২] বলেন- 'বর্তমানে তথ্য, যুক্তি ও সিদ্ধান্তের পরস্পর অন্বয়ের দ্বারা প্রকৃষ্ট বন্ধনের ভেতর দিয়ে পরস্পর অন্বিত হইয়াছে এবং একটা সমগ্রতা লাভ করিয়াছে, তখনই তাহা প্রবন্ধ আখ্যা লাভ করিয়াছে। তথ্যের সহিত্যতত্ত্বের পরস্পর অন্বয় এবং পারম্পর্য এবং তথ্য ও যুক্তির পরস্পর অন্বয় এবং সকল জুড়িয়া শেষ পর্যন্ত একটি সুসঙ্গত সিদ্ধান্তে গমন ইহাই প্রবন্ধের বিশিষ্ট লক্ষণ।' প্রবন্ধের মধ্যে যুক্তি, তথ্য প্রমাণাদিসহ লেখকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

প্রকাশ পাবে। বাংলা প্রবন্ধ ও রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, 'প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সন্দর্ভ, রচনা প্রভৃতি শিরোনামায় যে সকল গদ্য লেখা বাঙলায় প্রচলিত তাহার ভিতরে যে অংশটা সত্যিকারের একটা সাহিত্যিক 'নির্মিতি' তাহাকেই আমি 'রচনা' আখ্যা দান করিয়াছি' (দ্রষ্টব্য: দে, ১৯৯৮)[১৫]।

শ্রী অধীর দে(১৩৬৬)[১৪] তাঁর পিএইচডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রকাশ করেন 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা' শিরোনামে। তার পরিচায়িকা অংশে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন, 'প্রবন্ধের প্রধান ধর্মই হইতেছে এই যে, ইহার মধ্য দিয়া প্রবন্ধ লেখকের কোন বিষয় সম্পর্কে আত্মোপলব্ধির পরিচয় প্রকাশ পায়।' অর্থাৎ যেসকল রচনা কেবলমাত্র তথ্যপরিবেশক, কোন প্রকার উপলব্ধি সঞ্চালন করে না, তা প্রবন্ধ হতে পারে না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন রায়ের উপলব্ধিজাত আত্মপ্রত্যয় বাঙালির মননে প্রবেশ করেছিল। আর সে কারণেই সংঘটিত হয়েছিল নবজাগরণ। আর তার প্রকাশ প্রবন্ধের মাধ্যমেই হয়েছিল। প্রবন্ধ হচ্ছে ব্যক্তির উপলব্ধিজাত প্রকাশ।

সাহিত্য সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ (১৩৬৪)[১১] প্রবন্ধের সংজ্ঞা নিয়ে বলেন, 'কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া লেখক কোন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে আত্মসচেতন নাতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেন তাহাকেই প্রবন্ধ বলা হয়।.. বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ আমাদের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর, দৃষ্টিকে সমুজ্জ্বল, জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করিয়া তোলে।' প্রবন্ধের ক্ষেত্রে লেখকের বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞানদৃষ্টি, বস্তুনিষ্ঠতা, নির্দিষ্ট কোন বিষয় অবলম্বনকে ঘিরে রচিত হবে। যা অনতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপ বলে পরিগণিত হতে পারে। আবার বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (২০১৪)[২৫] প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন, 'যে-কোনো সংক্ষিপ্ত গদ্য রচনা বা বিষয়বস্তুকে আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপিত করে কিংবা কোন বিষয়ের অন্তর্গত বক্তব্যকে নিষ্কাশিত করে যুক্তির মাধ্যমে পাঠককে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করে তাকেই সাধারণভাবে প্রবন্ধ বলা হয়।' তিনি যুক্তির মাধ্যমে বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনাকে পাঠকের সিদ্ধান্ত নির্ণায়ক বলেছেন। বাংলায় তত্ত্বাশ্রয়ী গদ্য রচনাকে সাধারণভাবে প্রবন্ধসাহিত্য বলা যেতে পারে। দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি চিন্তনীয় বিষয়কে তথ্য ও তত্ত্বের মাধ্যমে এবং যুক্তির শৃঙ্খলায় পরিস্ফুট করে তোলাই যথার্থ প্রবন্ধের লক্ষণ। প্রবন্ধকে নৈর্ব্যক্তিক হতেই হবে। বস্তুভিত্তিক এবং যুক্তিভিত্তিক গদ্যরূপ নির্মিতি প্রবন্ধের মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য নিয়েও সাহিত্য সমালোচকগণ বিবিধ মতামত দিয়েছেন। ইংরেজি essay-র মত বাংলা প্রবন্ধের বিভিন্ন বিভাজন রয়েছে। যেমন- নিবন্ধ, সন্দর্ভ, প্রস্তাব, বিবিধ সমালোচনা প্রভৃতি। সাহিত্য রচনায় 'প্রবন্ধ' শব্দের প্রচলনের পূর্বে 'প্রস্তাব' শব্দের প্রচলন লক্ষ্য করা যায় ঊনবিংশ শতকে । এই শতকের প্রথমার্ধে রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীরা নিজেদের লেখার সঙ্গে 'প্রস্তাব' শব্দটি যোগ করতেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁদের লেখায় প্রস্তাব ও প্রবন্ধ দুটি শব্দই ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিম তাঁর বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞানরহস্যের প্রথম সংস্করণে 'প্রস্তাব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'ধূলা' প্রবন্ধ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, ' আচার্য্য টিন্ডলও ধূলা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া ধূলা সামান্য তত্ত্ব বলিয়া বোধ হয় না, অত গুরুতর এবং দুর্জ্ঞেয় বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়'(বাগল, ১৪১৭)[২০]।

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

তারপর রবীন্দ্রনাথ থেকে আর 'প্রস্তাব' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় না। যেহেতু প্রবন্ধে লেখককে কল্পনা আর বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করে একটি সুচিন্তিত এবং সুনির্দিষ্ট নৈর্ব্যক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় সে কারণে 'প্রস্তাব' শব্দটির ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায় (সিনহা, ২০১২)[৩৮]।

বাংলা সাহিত্যে ১৮০০ শতকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলার প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের (১৭৬২-১৮১৯) রচনাতেই প্রথম প্রবন্ধ লেখার আভাস পাওয়া যায়। সে হিসেবে তাঁর রচনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর লেখা 'বেদান্তচন্দ্রিকা'(১৮১৭) আদি প্রবন্ধ রচনার নিদর্শন। রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্ত গ্রন্থ, বেদান্তসার এর জবাবে মৃত্যুঞ্জয় 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' রচনা করেছিলেন। দুরূহ বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার বিশ্লেষণ বাংলা ভাষায় সম্ভব সেটা প্রমাণ করার জন্যই তিনি এটা রচনা করেছিলেন। তিনিই বাংলা গদ্যের প্রথম সক্ষম শিল্পী ছিলেন (দ্রষ্টব্য: হাই ও আহসান, ২০১৫)[৪২]। তাঁর প্রবন্ধের তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল- সংস্কৃতানুসারী সাধুরীতি, তদ্ভব শব্দপ্রধান সহজ সরলরীতি, তৎসম ও তদ্ভব শব্দের মিলনজাত রীতি। তবে রামমোহন রায়ের হাতে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। পাশাপাশি বেশ কয়েকজন বাঙালি লেখকেরাও এ বিষয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। আর প্রবন্ধের পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গদ্য রচনার বাহন হিসেবে বিবিধ সাময়িকপত্র প্রকাশ হয়। এগুলো ছিল সাহিত্যচর্চার হাতিয়ার। এই শতকের প্রথমার্ধে প্রথম বাংলা বিজ্ঞান ম্যাগাজিন 'দিগদর্শন' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে। তারপর থেকেই জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে বিজ্ঞান লেখার। নানাবিধ প্রবন্ধ সমূহ প্রকাশ হতে থাকে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে রায় ও অন্যান্য সম্পা.(২০০২)[৩২] বলেন, 'বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সাময়িক পত্রে এবং স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটির (বিবিধার্থ সংগ্রহ ও রহস্য সন্দর্ভ পত্রিকায়) উদ্যোগে প্রকাশিত ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মিশনারীরাও বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মূল কথা প্রকাশ করতে শুরু করেন। ফেলিক্স কেরী (১৮২২) লিখেন শরীরের গঠনে পেশী ও হাড়ের ভূমিকা নিয়ে গ্রন্থ *বিদ্যাহারাবলী*, পিয়ার্সন লিখেন ভূগোল বিষয়ে, ফাদার লোসন লিখেন *পশ্বাবলী*। দ্বিতীয় যে জনপ্রিয় বাংলা বৈজ্ঞানিক পত্রিকাটি প্রকাশ হয়েছিল ১৮২২ সালে তার নাম 'পশ্বাবলী'(The Animals)। ফাদার লোসন ছিলেন এই পত্রিকার কর্ণধার। প্রতি সংখ্যাতেই থাকত এক একটি পশু বিষয়ক রচনা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সিংহ, ভালুক, হাতি, গন্ডার, হিপ্পো, বাঘ ও বিড়াল বিষয়ক প্রবন্ধ। ছয় বৎসর কাল এই পত্রিকাটি প্রকাশ হয়েছিল (দ্রষ্টব্য: Mondol, 2012)[58]। 'পশ্বাবলী' প্রকাশের দশ বছর পর ১৮৩২ সালে 'বিজ্ঞান সেবধি' নামে আর একটি পত্রিকা কলকাতা সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। সেখানে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় অনুবাদ করা হোত। অবশ্য পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় নানাবিধ সমস্যার কারণে। এর পরবর্তী বছর ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক বাংলা সাময়িকপত্র 'বিজ্ঞানসার সংগ্রহ' নামে। যদিও এটি মাত্র এক বছরকাল প্রচলিত ছিল। এটি ছিল দ্বি-ভাষিক পত্রিকা। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই ছাপানো হোত একসাথে। সাময়িক পত্রিকাতেও মিশনারীরা বিজ্ঞান লিখেছিলেন। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বঙ্কিমের মধ্যেই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানচেতনার জন্ম হয়নি। তার পূর্বে আর দুজন শিক্ষাবিদ এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই ধারাটিকে নতুনরূপে প্রবাহিত করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) ও অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে ভারতীয় করার চেষ্টা করেছেন। মাত্র একুশ বছর বয়সে অক্ষয় কুমার দত্ত বিজ্ঞানের বিষয়ে বই লেখেন *ভূগোল* নামে। বাংলা ভাষায় বাঙালির রচিত এটাই বিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম বই। ১৮৫৬ সালে তিনি পদার্থবিদ্যা নামেও একটি বই লেখেন। এগুলো পাঠ্য বই

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

হিসেবে প্রচলিত ছিল। রবীন্দ্রনাথও তাঁর লেখা বই পড়ে বিজ্ঞান শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন (ঠাকুর, ১৩৪৮)[৮]। অক্ষয়কুমারের লেখা 'চারুপাঠ'(প্রথম ভাগ ১৮৫২, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪, তৃতীয় ভাগ, ১৮৫৯) বাংলাদেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারে ভূমিকা রেখেছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের *চারুপাঠ* ও বিদ্যাসাগরের *বোধোদয়* স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার জন্য রচিত অনন্য দুটি গ্রন্থ। তাঁদের লেখনীর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে গতি ছিল তা শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের স্বার্থে তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন। আর একজন হলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৭১-১৮২২)। তিনি বাংলা ভাষায় জ্যামিতি বিষয়ে লিখেছেন। রাজেন্দ্র লাল (১৮৮৫-১৮১৩) মিত্র লিখেছেন অনেক বিষয়ে। ভূগোলের বিজ্ঞানকে তিনি সহজবোধ্য ভাষায় লেখার কৃতিত্ব দেখান। সে সময় বেশ কিছু পত্রিকা সুনাম অর্জন করেছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত *তত্ত্ববোধিনী* ১৮৪৩ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী' প্রকাশের এক দশক আগে জ্ঞানান্বেষণ, বিজ্ঞান সেবধি, বিজ্ঞানসার সংগ্রহ প্রভৃতি পত্রিকা বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেছে। দর্শন ও বিজ্ঞান পরস্পর অন্বয়যুক্ত। বাঙালী মনীষার প্রথম দক্ষ প্রবন্ধশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত প্রবন্ধ রচনা করেন (বাগল, ২০১৮)[২১] 'দর্শন ও বিজ্ঞান' বিষয়ে। সেখানে তিনি ভারতীয় দর্শন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার,পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেন। যার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে একটা বিজ্ঞান শিক্ষার ও প্রচারের পরিবেশ তৈরি হয়েই ছিল। পরবর্তীকালে বঙ্কিম নিজেই এই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম প্রবন্ধ রচনায় এককভাবে ক্ষমতাসীন ছিলেন। এছাড়াও সমকালে রামগতি ন্যায়রত্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালিপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীশচন্দ্র দাশ প্রমুখ লেখকগণ প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধি দান করেছেন। তবে তাঁদের কেউ বঙ্কিমের প্রতিভাকে ম্লান করতে পারেননি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যের দুটো ধারা প্রবাহিত ছিল। একটি হলো সাধুভাষা আর অপরটি কথিত ভাষা। সাধু ভাষায় সমাজের এলিট শ্রেণী সাহিত্যচর্চা করত। সেখানে সংস্কৃতবহুল শব্দের প্রাধান্য ছিল। যার ফলে এই দুর্বোধ্য সংস্কৃতবহুল শব্দে সাহিত্য রচনার পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল বাংলা শব্দের অপ্রতুলতার কারণে সাহিত্যিক গদ্যের পথ তৈরিতে বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল। সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরে চলে যাচ্ছিল সাহিত্য। সাহিত্যিক ভাষা একটি সংকীর্ণ স্রোতে প্রবাহিত ছিল। প্যারীচাঁদ মিত্রই বাংলাভাষাকে এই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করলেন। সাধারণ মানুষের জীবনের চালচিত্র এবং প্রাত্যহিক কথোপকথন নিয়ে রচনা করেন উপন্যাস *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮)।

তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃতী পুরুষ বঙ্কিমই প্রথম বিচিত্র ধারায় সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, ধর্মকথা, দর্শন, শাস্ত্রকথা, শিল্পতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা ভাষার একটি গ্রহণযোগ্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। হরপ্রসাদ মিত্র (১৯৬৩)[২৯] বলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের প্রথম ভাবনেতা। তিনিই আমাদের সর্বাধিক সংখ্যক পাঠকের বোধগম্য প্রথম ভাবুক শিল্পী'। বঙ্গদর্শন প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র সমাচার দর্পণ (১৮১৮) ও সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১) পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন। Bengali Literature (১৮৭১) প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা যা প্রথম The Calcutta Review পত্রিকায় প্রকাশ পায়। বঙ্কিম সমসাময়িক বিজ্ঞানের জগতে পরিপূর্ণ দীক্ষা নিয়ে ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে গভীর অনুরাগ সহকারে অধ্যয়ন করেছিলেন। যার ফলে তিনি *বিজ্ঞানরহস্যের* প্রবন্ধগুলো লিখতে সমর্থ হন(দ্রষ্টব্য: ভট্টাচার্য,১৯৬০)[২৩]। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন ১৮৫২ এ কবি ঈশ্বরগুপ্ত

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

সম্পাদিত *সংবাদ প্রভাকর* (১৮৩১) পত্রিকার মাধ্যমে। ১৯৬৪ ইংরেজিতে উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। 'রাজমোহনস ওয়াইফ' নামে একটি উপন্যাস ইন্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শন প্রকাশের মাধ্যমে প্রাবন্ধিক বঙ্কিম বিজ্ঞানের আশ্চর্য আবিষ্কারের জগতে আমাদের দৃষ্টিপাত করান। একজন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বাংলা ভাষায় ইউরোপীয় জ্ঞানকে করায়ত্ত করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য গঠন ও বিষয়বৈচিত্র্যে এক স্বতন্ত্র বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। তিনি বিবিধ প্রসঙ্গ অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করতে আরম্ভ করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'লোকরহস্য'(১৮৭৪), 'বিজ্ঞান রহস্য'(১৮৭৫), 'কমলাকান্তের দপ্তর'(১৮৭৫), 'সাম্য'(১৮৭৯), 'প্রবন্ধপুস্তক'(১৯৭৯), 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৮৭, ১৮৯২), 'ধর্মতত্ত্ব'(১৮৮৮) ইত্যাদি। বঙ্কিম এক পূর্ণ যুগ ধরে বাঙালি পাঠক সমাজে সাহিত্যবোধ নির্মাণ করেছেন।

আমরা জানি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) একটি বড় জায়গা নিয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রথম সম্পাদক ও প্রকাশক। দীর্ঘ চার বছর তিনি এই সম্পাদনার কাজ করেছেন। তিনি মননশীল প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি উপযুক্ত পাঠক তৈরী করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়- (ক) জ্ঞান ও বিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধ, (খ) ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ, (গ) সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ, (ঘ) সমাজবিষয়ক প্রবন্ধ, (ঙ) বিবিধ প্রবন্ধ। তাঁর পরে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। পত্রিকার কোন পৃষ্ঠায় কোন লেখা ছাপা হবে সে বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রই সিদ্ধান্ত নিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক করলেন দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে বঙ্গদর্শনে সব খবরের সঙ্গে বিজ্ঞান লেখাও থাকবে। লেখক হিসেবে বঙ্কিম নিজেই বিজ্ঞান বিষয়ে লেখার পরিকল্পনা করেন। এভাবে বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় এক সাহিত্যিক পরিমন্ডল। বঙ্গদর্শনে যারা সাহিত্য চর্চা করতেন তারা হলেন- চন্দ্রনাথ বসু, দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই সাহিত্যিক গোষ্ঠী ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধের গতিপথ নির্মাণে অবদান রেখেছেন।

আজ অবধি বাংলাভাষায় বঙ্কিমসাহিত্য নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত গ্রন্থ 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় (তাঁর মৃত্যুর পর)[৩৭]। এই গ্রন্থে বঙ্কিম নিয়ে রচিত প্রবন্ধসমূহ তিনি একত্রে সংকলিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের লেখা বঙ্কিম জীবনী ও আলোচনা এতে স্থান লাভ করেছে। সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত গ্রন্থটি বঙ্কিম গবেষণার জন্য উপযুক্ত একটি সংগ্রহ।

অরবিন্দ পোদ্দার ১৯৫১ সালে বঙ্কিম সাহিত্য নিয়ে পিএইচডি অভিসন্দর্ভ প্রকাশ করেন গ্রন্থাকারে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. সুবোধ সেনগুপ্ত এই রচনার প্রশংসা করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে ঢাকা বুকস ফেয়ার (২০১৩)[১৬] 'বঙ্কিম মানস' গ্রন্থটি পুনরায় প্রকাশ করেন। গ্রন্থে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও সনাতন হিন্দু চিন্তাধারার বিরোধের মধ্যে বঙ্কিমের দার্শনিক চিন্তা, মন ও শিল্প বিবর্তনের স্বরূপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। শ্রী অধীর দে (১৩৬৬)[১৪] 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা' বিষয়ে তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভে ঊনবিংশ শতকের প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে 'বঙ্কিম পর্ব' (১৮৭২-৯০)

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বঙ্কিম পরবর্তী উনবিংশ শতাব্দীর আর এক কৃতী পুরুষ প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) 'বঙ্কিমচন্দ্র' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন (দ্রষ্টব্য: সৈয়দ, সম্পা. ২০১৭)[৪১]। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বঙ্কিমচন্দ্র' নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন (দ্রষ্টব্য: ঘোষ, ২০১৫)[২]। রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য'(১৩১৪) গ্রন্থে এই প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেখানে বঙ্কিমকে সেকালের শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ, কর্মযোগীপুরুষ হিসেবে অভিহিত করেছেন (দ্রষ্টব্য: বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ)। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন'(বঙ্কিমচন্দ্র, *আধুনিক সাহিত্য*)। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের ভাষা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আলো বলেন,'বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস নহে; উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে'(বঙ্কিমচন্দ্র, *আধুনিক সাহিত্য*)। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীগ্রন্থ লেখার চেষ্টা অনেকেই করেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কাশীনাথ দত্ত, নবীনসেন, রবীন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ সাহিত্যিকেরা বঙ্কিমের স্মৃতিকথা লিখে প্রকাশ করেছেন। শ্রী প্রমথনাথ বিশী (২০১৪)[২২] *বঙ্কিম সরণী* গ্রন্থে বঙ্কিমের প্রতি আমাদের অন্যায় অভিযোগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন,বঙ্কিমের অসামান্য সৃষ্টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বঙ্গদর্শন ও কমলাকান্ত। বঙ্কিমপাঠের জন্য অপরিহার্য ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বই শ্রী শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৩৬৭)[১২] *বাঙলা-সাহিত্যের একদিক* গ্রন্থে প্রথম যুগের রচনাকারগণ, বাংলা প্রবন্ধ ও বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান, বঙ্গদর্শনের লেখকগণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সাহিত্যে প্রবন্ধের জন্মলগ্ন থেকেই বিজ্ঞানচর্চা হয়ে এসেছে। বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানের উপস্থিতি ও বঙ্কিমের প্রবন্ধ সম্পর্কে ড. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (১৯৬০)[২৩] *বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান* গ্রন্থে লিখেছেন, 'পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি বরাবরই বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণ ছিল। বাল্যকালে সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে গণিত ও ভূগোলেও তিনি পারদর্শীতা দেখান। গণিতে প্রায়ই তিনি ক্লাসের ছাত্রদের থেকে এগিয়ে থাকতেন। কলেজে বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল মনস্তত্ত্ব, প্রাকৃতিক ভূগোল, গণিত, জরীপবিজ্ঞান ইত্যাদি '(দ্রষ্টব্য: শিবাষীস বসু, ২০২০)[৪৩]। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (১৯৬০)[২৩] বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস প্রসঙ্গে আরো বলেন, 'উপন্যাস, প্রবন্ধ ও সমালোচনাকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় যে সংস্কার সাধন করেছিলেন তারই পরিচয় পাওয়া গেল বঙ্গদর্শনের বিজ্ঞানালোচনাগুলোতে'।

সোমেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত (১৯৬০)[১৯] 'কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিভিন্ন বাঙালি লেখক ও সাহিত্যিকদের সম্পর্ক বর্ণনা করেন। এতে তিনি ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রাধান্য দিয়ে লিখেছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আমাদের উদাসীনতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিবিধ কারণে বঙ্কিম আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছেন। একজন যুগ প্রবর্তক সাহিত্যিক সম্পর্কে অনেকেই নানান অভিযোগ প্রকাশ করেছেন। সাহিত্য সমালোচক ও লেখক নাজিরুল ইসলাম সুফিয়ান (১৯৪৯)[৪০] তাঁর লেখা 'বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস' গ্রন্থে মুসলিম বিদ্বেষী মানসিকতার কারণে বঙ্কিমের তীব্র সমালোচনা করে তাঁকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে আখ্যায়িত করেন।জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক আহমদ ছফা (২০০৮)[৭] 'শতবর্ষের ফেরারি: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' শিরোনামে একটি গ্রন্থ

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

লিখেছেন। তিনি বঙ্কিম প্রতিভা সম্পর্কে মন্তব্য করেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন অদ্ভুতকর্মা পুরুষ ..যুগান্তকারী সাহিত্যস্রষ্টা, আধুনিক বিজ্ঞানচিন্তার অনুসারী বঙ্কিম.. পুরাতাত্ত্বিক বঙ্কিম: এই এক মানুষের ভেতর এতগুলো বৈশিষ্ট্য একটা আরেকটার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে'(শ.ব.ফে. পৃ.৩৬১)। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশিক্ষা ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, 'অক্ষয় দত্ত প্রমুখ বিজ্ঞান কর্মীদের মনে যে বিজ্ঞান চিন্তা ঝিলিক দিচ্ছিল, সে বস্তু জিজ্ঞাসাও অল্প-স্বল্প পরিমাণে বঙ্কিমের অভিনিবেশের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পেরেছিল' (শ.ব.ফে. পৃ.৩৬২)।

বঙ্কিম রচনাবলী সম্পাদক যোগেশচন্দ্র বাগল (২০১৮)[২১] তাঁর *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা* গ্রন্থে বলেন, 'বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত জটিল তত্ত্বসমূহ সরল ও সরস করিয়া বঙ্কিম বিভিন্ন প্রবন্ধে 'বঙ্গদর্শন' মারফত পরিবেশন করিতেন।'

এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন ইংরেজি ম্যাগাজিনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকটি। যেমন: অমিয় সেন (২০০৮), আশিষ লাহিড়ী(২০১৭), এস কে মজুমদার (২০১৪), এন.সি মন্ডল (২০১২) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের বিবিধ বিশ্লেষণাত্মক লেখনী লক্ষ্য করা যায়। বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ নিয়ে আরো যারা গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (১৯৭৮), ভবতোষ দত্ত (১৯৬১), সত্যনারায়ণ দাশ (১৯৭৪), ড. ভবানী গোপাল সম্পা.(২০০৯), বিজলি সরকার (২০০৯), ড. শফিউদ্দিন আহমদ (২০১০), হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পা.(২০১২), শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়(২০১৩), যোগেশচন্দ্র বাগল (২০১৮), সুনির্মল বসু (১৯৯৬), বিধান মিত্র (২০১৬, ২০১৯) এবং বিবিধ আলোচনা ও প্রবন্ধ লিখেছেন যেমন- শিবাশীষ বসুর (২০২০)[৪৩] 'বঙ্কিমচন্দ্র: বস্তুবাদী থেকে ভক্তিবাদী', সুর্যসেন গুপ্তর (২০২২)[৪৪] 'নগন্য কাব্য থেকে মহান গদ্যে উত্তরণ: রসস্রষ্টা ও প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' প্রভৃতি শিরোনামে।

কালক্রমে বাংলা আজ আর কোন অবহেলার পাত্র নয়। এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে বাংলাভাষা সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চার উপযুক্ত মাধ্যম। বঙ্কিম কেবল একজন লেখক বা ঔপন্যাসিক ছিলেন না। একাধারে তিনি একজন অনুরাগী পাঠক, গবেষক, সম্পাদক, সমালোচক এবং প্রকাশক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বঙ্কিমের অবদানের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর মেধা ও মননের প্রশংসা করেছেন। বঙ্কিমই প্রথম বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানের প্রতি জনপ্রিয়তা তৈরিতে সচেষ্ট ও সফল হয়েছিলেন। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় চৈতন্যে প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিলেন। বঙ্কিমই সর্বপ্রথম প্রবন্ধকে প্রথম শ্রেণির মর্যাদায় উন্নীত করেন। তাঁর প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ অবলম্বন করেই। আর এই প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং সাহিত্যের পথকে সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও সুগম করেছিলো সেকালের বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলো। ঔপনিবেশিক শাসনামলে সমগ্র ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশের অধীনে। তখন অবিভক্ত বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে মোট ৬৫টি বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বিজ্ঞানের বিপুল বিষয়ে বিবিধ প্রবন্ধ রচিত হয়। এসময় পরিচিত অপরিচিত সকল লেখকরাই বিজ্ঞানকে অধিক জনপ্রিয় ও ব্যবহার উপযোগী করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। নিত্যনতুন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও মানব সভ্যতার উন্নয়নে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার কারণে বিভিন্ন লেখকরা প্রবন্ধ রচনা আরম্ভ করেন। এ সময় অনেক লেখকেরা জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখার পাশাপাশি নানাবিধ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীও রচনা শুরু করেন। এ সকল উদ্যোগ বিজ্ঞানকে সাধারণের নিকট দ্রুত আকর্ষণীয় করে তুলতে সক্ষম হয়। প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী রচনার একটি প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। এই ধারা আজ অবধি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ চর্চার উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। নবীন গবেষকেরা এই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। বিচিত্র গবেষণা সন্দর্ভ লিখিত হচ্ছে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা বিষয়ে। বঙ্কিম সাহিত্যের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও গবেষণা রয়েছে। তবে বিজ্ঞান নির্ভর প্রবন্ধ নিয়ে বঙ্কিমের কোন প্রবন্ধগ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বাংলা সাহিত্যে নেই বললেই চলে। আর সে লক্ষ্যেই বর্তমান সন্দর্ভটি সমালোচনা সাহিত্যে ও বিজ্ঞান চর্চায় একটি নতুন সংযোজন।

৩. গবেষণার যৌক্তিকতা:

বাংলা সাহিত্যে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। বঙ্কিম একাধারে প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ। তাঁর উপন্যাস জনপ্রিয়তায় প্রবাদপ্রতিম। বলা যায় প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার আড়ালেই পড়ে আছেন। আমার জানা মতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ সম্পর্কে একটিও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ পাওয়া যায় না। প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বিজ্ঞান আলোচনা। যদিও বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ আলোচনা ও গবেষণা খুব কম পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমের *বিজ্ঞানরহস্য* নিয়েও কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পরিদৃষ্ট হয় না। তাই এ প্রবন্ধগ্রন্থটির সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। কেননা এটি ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে বৈজ্ঞানিক সত্য উদঘাটনের একটি সার্থক প্রয়াস (মিত্র,২০১৬)[২৮]। আর সেকারণেই তাঁর সুবিপুল সাহিত্যালোক থেকে নির্বাচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ আলোচনা বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধের অভিষ্ট লক্ষ্য।

সাহিত্যে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় এখন যুগের দাবী। সাহিত্যে বিজ্ঞানচর্চাকে উৎসাহিত করা, নতুন প্রজন্মকে সঠিক যুক্তিনির্ভর আধুনিক শিক্ষাপ্রদানে এ ধরণের গবেষণার কোন বিকল্প নেই। কালক্রমে সাহিত্যে বিজ্ঞান নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাহিত্যচর্চাও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। বিশেষ করে শিক্ষার্থী. শিক্ষিত মহিলাদের অন্দরমহলে ও শিশুশ্রেণীতে সহজবোধ্য বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার কোন বিকল্প আছে বলে জানা নেই। সমাজ থেকে কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা দূর করতে বিজ্ঞান শিক্ষা অপরিহার্য যেটা বঙ্কিম অনুভব করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে। বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান বিষয়কে অধিকতর সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে আমার এ প্রয়াস। সাহিত্যে বিজ্ঞানচিন্তার প্রতিফলন, আধুনিক জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজনে এ জাতীয় গবেষণার কাজে সাহিত্যামোদীদের প্রণোদিত করা বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য। আর তাই বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্মৃতপ্রায় প্রাবন্ধিক সত্তাকে সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়ার মানসিকতা থেকে আলোচ্য গবেষণার অবতারণা। তরুণ সমাজে বঙ্কিমের প্রবন্ধের চর্চা, আধুনিক মনস্ক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধকরণ বর্তমান গবেষণার অভীষ্ট। *বিজ্ঞান রহস্য* (১৮৭৫) প্রবন্ধের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা ও বঙ্কিমের বিজ্ঞানদর্শন আলোচনা ও ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ গবেষণার জগতে নতুন ক্ষেত্র তৈরী করবে বলে আমার বিশ্বাস। সঙ্গত কারণেই বিষয়টি নিয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা বিদ্যমান।

৪.গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা শব্দটির অর্থ অন্বেষণ বা অনুসন্ধান। গবেষণা শব্দটি দ্বারা কোন কিছু খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা করা বোঝায়। গবেষণা সম্পর্কে Kothari (2004)[51] বলেন, 'Research is an academic activity and such the term chould be used in a technical sense'। গবেষক সর্বদাই সত্যনিষ্ঠ। কাজেই আমাদের উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণ, সত্যানুসন্ধান ও মুল্যায়ন। বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে সাধারণত দুটি উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে । প্রাথমিক উৎস ও দ্বৈতিয়ীক উৎস। প্রাথমিক উৎসের জন্য

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

নির্বাচিত প্রবন্ধের বর্ণনা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ, দ্বৈতিয়ীক উৎস হিসেবে বিভিন্ন আলোচনা ও সমালোচনা গ্রন্থ, সন্দর্ভ, প্রবন্ধ,সাময়িকী, রচনাপাঠ ও গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও তথ্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ গুণগত পদ্ধতির মাধ্যমে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ শেষে গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধ বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বর্ণনা ও পর্যালোচনা, সাংগঠনিক দিক বিশ্লেষণ, উপস্থাপন কৌশল, গদ্যশৈলীর গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয় এবং যুগের চাহিদানুযায়ী আলোচনাকে অধিক ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুণগত পদ্ধতির পাশাপাশি ভাষাবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হয়েছে।

৫.বঙ্কিমের বিজ্ঞান দর্শন, তত্ত্ব ও 'বিজ্ঞানরহস্য'

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবাদ পুরুষ বঙ্কিমের চিন্তা ও দর্শনে পাশ্চাত্য প্রভাব ছিল ক্রিয়াশীল। যার দ্বারা তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন কৌশলগত দিক এবং তার পাশাপাশি ঘটিয়েছিলেন সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তার জাগরণ। সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পাঠ করতেন। তাঁর এই অনুসন্ধিৎসু মন ও বিজ্ঞান চিন্তার ফলাফল আমরা লাভ করি। বাংলা সংবাদ মাধ্যমে তাঁর অনুপ্রবেশের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাসমূহ প্রকাশিত হয়। তাঁর মাসিক পত্রিকা *বঙ্গদর্শন* (১৮৭২) শুরু করেছিলেন এ প্রবন্ধগুলো দিয়ে। উদ্দেশ্য ছিল নানাবিধ। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা। আগ্রহী লোকসমাজ, উচ্চতর স্কুল শিক্ষায় এবং মহিলাদের মাঝে বিজ্ঞান বিষয়ক সচেতনতা তৈরি করা। ১৮৭২ সালে ড. মহেন্দ্র লাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪) Indian Association for Cultivation of science গঠন করেন (Kocchar, 2008)[50]। যা ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা নামে পরিচিতি লাভ করে। পশ্চিম সভ্যতার বাইরে ভারতই প্রথম দেশ হিসেবে বিজ্ঞানচর্চায় এগিয়ে আসে। বিজ্ঞানের প্রসারে বঙ্কিম ড. মহেন্দ্রলালকে সহায়তা করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীতে সত্যেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (১৯৪৮) গঠন করেছিলেন। *বঙ্গদর্শনে* ১৮৭২ থেকে ১৮৭৫ পর্যন্ত ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের লেখা বিষয়াবলী প্রকাশিত হয়েছিল। যাদের অধিকাংশই ১৭শ থেকে ১৯শ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা ছিলেন। আর এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা হলেন- ইভান গেলিস্টা টরিসেল্লি(ইতালীয়), ব্লেইজ প্যাসকেল(ফরাসী), চার্লস লেইল(স্কটিশ), জন টিন্ডল(আইরিশ), টি এইচ হাক্সলে, নরম্যান লকিয়ার, রিচার্ড এ প্রোক্টর(ইংলিশ) প্রমুখ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন জীববিজ্ঞান, গণিত, পরিসংখ্যান,পদার্থবিদ্যা, জিওলজি ও নৃ-তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা বিজ্ঞানচর্চা করতেন। বঙ্কিমের বিজ্ঞান সম্পৃক্ততার বিষয়ও ছিল এসব। সমকালীন বিজ্ঞানের সাথে বুদ্ধিবুত্তিক সংযোগ ছিল বঙ্কিমের।

দার্শনিক বঙ্কিম প্রথম জীবনে কোঁৎ, মিল, বেন্থাম, লক, হ্যামিলটন, স্টুয়ার্ট, স্পেন্সার প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদ ও তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অক্ষকুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক সৃজিত বৈজ্ঞানিক পাঠ্যগ্রন্থসমূহ ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্কিম বিষয়টিকে অধিক দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বৈজ্ঞানিক করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ভারতবর্ষীয় সমাজে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। এ প্রসঙ্গে এম আব্দুল আলিম বঙ্কিম প্রসঙ্গে বলেন,

> "বঙ্কিম প্রচলিত সাহিত্যাদর্শের বিরূদ্ধেও সোচ্চার ছিলেন। এক্ষেত্রে অগাস্ট কোঁৎ এর পজিটিভিজম বা বিজ্ঞান সম্মত মানব সেবাধর্ম তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। এর ফলে ব্যক্তি মানুষ অপেক্ষা সমগ্র মানবজাতি তথা সমষ্টির কল্যাণে তিনি স্বীয় চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।"

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

বঙ্কিম হিন্দু সমাজের নানা অসংগতির বিরুদ্ধে ১৮৭৩ সালে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধ *The Study of Hindu Philosophy'*তে হিন্দু দর্শনের অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার নিন্দা করেছেন। হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতিকে সমালোচনা করেও মন্তব্য করেন তিনি। পৌরাণিক দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এগুলো কাল্পনিক চরিত্র ছাড়া কিছুই নয়। শুধু বিজ্ঞান ও যৌক্তিক মনই পারে এই হিন্দু বিশ্বাসকে উপরে ফেলতে। তবে জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চার ফলে তিনি ঘোরতর সংশয়বাদী হয়ে উঠলেও হিন্দু সনাতন ঐতিহ্য তাকে হাতছানি দিয়ে বার বার ডেকে এনেছে। বৈজ্ঞানিক সূক্ষদর্শিতা তাঁর সনাতন নীতি ধর্মবোধের সীমা অতিক্রম করতে পারেনি। আধুনিক জীবনবোধ যুক্তিবাদ, মানবপ্রত্যয়, ইহজাগতিকতা প্রভৃতি তাঁকে পরিচালিত করেছে। ১৯৯৪ সালে বঙ্কিমের উপর একটি ৬৫০ পৃষ্ঠার ভলিউম প্রকাশিত হয় (*Bankimchandra: Essays in Perspective*) । সম্পাদক ভবতোষ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৪)[৪৭] তাতে বঙ্কিমের সমগ্র জীবন ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু এই আলোচনাতে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার কোন রচনা পাওয়া যায় না।

অনেক আধুনিক প্রথিতযশা লেখকদের অভিযোগ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একাধিক লেখায় প্রাচীন ভারতীয়ত্বের তথা হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তিনি মধ্যযুগের ধর্মপ্রবণতা ছাড়তে পারেননি। বঙ্কিমের বিজ্ঞান ভাবনা ও তার চিন্তার বিবর্তন সম্পর্কে আশীষ লাহিড়ী (২০১৭)[৩৪] 'বিজ্ঞান ও মতাদর্শ' গ্রন্থে বলেন,'হিন্দুত্ববাদী বঙ্কিম বিজ্ঞানবাদী পজিটিভিজমের নিরিখে প্রাচীন হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন।' ১৮৭৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্র The study of hindu philosophy প্রবন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানচিন্তার প্রভেদ কোথায়, তা ব্যাখ্যা করেন (লাহিড়ী, ২০১৭)[৩৪]।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক (ছফা, ২০১৩)[৬] এক সাক্ষাৎকারে বঙ্কিম প্রসঙ্গে বলেন, 'বঙ্কিম যদিও সাহিত্য সৃষ্টিতে আধুনিক ছিলেন, কিছু বিষয়ে ছিলেন ধর্মান্ধ।' একজন দার্শনিক, সমাজসংস্কারক, যুগ প্রবর্তক, শ্রেষ্ঠ মনীষী শেষ বয়সে ধর্মীয় ভক্তিবাদে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এমনটি আরো অনেক দার্শনিকদের জীবদ্দশাতেই ঘটতে দেখা যায়। তবে সাম্প্রদায়িক ভাবধারার লালন ও পোষণ শিল্পবোদ্ধা, সমাজকল্যাণকামীদের অভিপ্রেত নয়।

প্রাচীনপন্থী মনোবিদ ম্যাকডুগাল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মর্ডাণ মেটিরিয়ালিজম অ্যান্ড ইমাজেন্ট ইভলিউশন'- এ লিখেছেন, 'নিউটন, পুপিন, লজ- এর মত অনেক বৈজ্ঞানিকের ধর্মীয় ও নৈতিক বিশ্বাসের কথা আমাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে, কিন্তু বুঝতে হবে এই বিশ্বাস কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে সৃষ্টি হয়নি' (দ্রষ্টব্য; রায়, ২০১৮)[৩১]। নিউটন ছিলেন গভীর ধর্মবিশ্বাসী মানুষ। পরিণত বয়সে তিনি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে একটি অযৌক্তিক লেখা লিখেছিলেন। যা জনসমাজে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল। ১৯৩২ সালে স্কটিশ দার্শনিক বিশিষ্ট অধ্যাপক হাইমেন লেভি (১৮৮৯-১৯৭৫) বলেন, 'অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের কঠিন শৃঙ্খল থেকে মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করতে বিজ্ঞানের সময় লেগেছিল কয়েক শতাব্দী। দুঃখের বিষয় সমসাময়িক অনেক বিজ্ঞানীর লেখা প্রমাণ করে সেই নিগড় থেকে এখনও মুক্ত হওয়া যায়নি'। বঙ্কিমের মধ্যেও এই বিবর্তনবাদী দর্শনচিন্তার আলোচনা প্রসঙ্গে শিবাশীষ বসু (২০২০)[৪৩] বঙ্কিমের বস্তুবাদী থেকে ভক্তিবাদীতে রূপান্তর প্রসঙ্গে যৌক্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেন। সেখানে তিনি বলেন, 'পাশ্চাত্য শিক্ষায়

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্রের একটি সত্তা সম্ভবত ভারতের উন্নতির জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের সাধনা যে অত্যাবশ্যক তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন।' আর সে কারণেই ভারতের উন্নয়নে ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলো লিখেছেন।

৬. প্রবন্ধ পর্যালোচনা

বঙ্কিমের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সর্বপ্রথম প্রবন্ধ সংকলন এই 'বিজ্ঞান রহস্য'(১৮৭৫) অর্থাৎ *বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসংগ্রহ* বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্যকর্মের এক অনবদ্য নিদর্শন। এটি ঊনবিংশ শতাব্দীর এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের দলিল যা বিজ্ঞানবিষয়ক রচনার অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এতে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। জ্যোর্তিবিজ্ঞানের উপর বঙ্কিমের আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। অত্যন্ত সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সহজবোধ্য উদাহরণ প্রয়োগ করে প্রবন্ধগুলো তিনি রচনা করেছেন। প্রবন্ধের ভাষা আগাগোড়া আমাদের মাঝে নান্দনিক বোধের চমক সৃষ্টি করে।

বঙ্কিম সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের তথ্য বিশ্লেষণ ও নিজস্ব প্রতিভার বিদ্যুৎচ্ছটার সম্মিলন ঘটিয়েছেন অবলীলায়। যার নমুনা আমরা প্রবন্ধ পাঠের মধ্যেই খুঁজে পাই। একজন গর্বিত ও একনিষ্ঠ সাহিত্যিককে এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের সমস্ত বিষয়েই জ্ঞানচর্চা করতে হয়। চিন্তানায়ক বঙ্কিম আমাদের সম্মুখে উন্মোচন করেছেন এক নতুন অভূতপূর্ব বিস্ময়কর জগত। এককথায় প্রবন্ধের বিচিত্র জগতে বঙ্কিমের পারদর্শিতা লক্ষণীয়। বঙ্কিম বিজ্ঞান শিক্ষাকে বেশ আকর্ষণীয় মনে করতেন।। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে একমাত্র বঙ্কিমই তাঁর প্রখর মেধা ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে বাঙালি সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তৈরি করেছেন এক নতুন মননশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত স্রোতোধারা। বঙ্কিমের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'(১৮৭২) পত্রিকা এক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। বিজ্ঞান রহস্যের প্রতিটি প্রবন্ধই এতে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে *বঙ্গদর্শন*কে কেন্দ্র করে বঙ্কিমের বিজ্ঞানশিক্ষিত একটি শিষ্যদল তৈরি হয়। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য তিনি নিরস বৈজ্ঞানিক বিষয়কে পরিচ্ছন্ন সাহিত্যরসে সঞ্জীবিত করে উপস্থাপন করেন।

বিজ্ঞানের জটিলতায় প্রবেশের পূর্বে তিনি প্রায়শই একটি সাহিত্যিক বাতাবরণ তৈরি করে নিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি আত্মস্থ করবার ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে লেখক হিসাবে তাঁর রসাত্মক মনোভাবও ফুটে উঠে প্রবন্ধ পর্যালোচনায়। যা সচরাচর তাঁর প্রবন্ধ পাঠককে আকৃষ্ট ও উজ্জীবিত করে। তিনি উনিশ শতকের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালি সমাজের অন্ধ বিশ্বাসের মর্মমূলে আঘাত করেছেন। *বিজ্ঞানরহস্য* (১৮৭৫)[২০] প্রবন্ধ সংকলনে যে ৯টি প্রবন্ধ আছে তা উল্লেখ করা হলো:

১. আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত
২. আকাশে কত তারা আছে ?
৩. ধূলা
৪. গগণ পর্য্যটন
৫. চঞ্চল জগৎ
৬. কত কাল মনুষ্য ?
৭. জৈবনিক
৮. পরিমাণ রহস্য
৯. চন্দ্রালোক

প্রকৃতপক্ষে মহাকাশ বিজ্ঞান এক বিস্ময়কর ও বিস্তৃত জগৎ। এই জগতে জ্ঞান আহরণ করা সমুদ্রতীরে নুড়ি কুড়ানো মাত্র। বঙ্কিম বিশেষ করে ভারতবর্ষীয় বাঙালি পাঠক সমাজের অজ্ঞানতার কথা বিবেচনা করেই বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধগুলো লিখেছেন। উচ্চ শ্রেণির

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

ছাত্রসমাজ, সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি ও আধুনিক শিক্ষিত বাঙালি মহিলা সমাজকে উদ্দেশ্য করেই তার এ ধরণের বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত। প্রতিটি রচনাই তার গভীরতা ও মৌলিকত্বে সমুজ্জ্বল। *বিজ্ঞানরহস্য* গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 'আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত'। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বঙ্কিম সূর্যের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন। যখন সূর্যের চারপাশের উপরিভাগে এক ধরণের চৌম্বকীয় শক্তি তৈরি হয় তখন হঠাৎ অত্যন্ত ক্ষীপ্র গতিতে উজ্জ্বল আলো উর্ধে নিক্ষিপ্ত হয়। এটা দেখতে মেঘের মত। এ ধরনের ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে, তবে সবসময় নয়। এ শক্তির এক ঝলকেই গোটা একটা পৃথিবী নিমিষেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এর শক্তি এত প্রচন্ড যে ১০০ মিলিয়ন মেগাটন হাইড্রোজেন বোমা একসাথে বিস্ফোরণ হলে যা হয়। এই ঝলক সাদা আলোর দাগের ন্যায় সূর্যপৃষ্ঠে দৃষ্ট হয়। বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধে সূর্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

> 'সূর্য্য অতি বৃহৎ তেজোময় গোলক।' 'সূর্য প্রচন্ড দাহকর কিরণমালার আকর। সূর্যপ্রতি দৃষ্টিপাত করার শক্তি মানুষের নাই। অথচ ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা অলঙ্ঘ্য প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত হয়েছেন আকাশব্যাপী সূর্যের মতই সকল নক্ষত্র বিদ্যমান। নভোমন্ডলের জ্যোতিষ্ক ও তারকারাজির দূরত্ব ও আলোক পরীক্ষক নামক আশ্চর্য যন্ত্র দ্বারা বিজ্ঞানীরা আকাশে তারকার সংখ্যা নির্ণয় করতে সক্ষম হন। সকল নক্ষত্রের প্রকৃতিও সূর্যের ন্যায়। অথচ সকলই বিন্দুবৎ দৃষ্ট হয়'(আশ্চর্য সৌরৎপাত,*বঙ্কিম রচনাবলী*,২য় খন্ড)[২০]।

এ রকম তথ্যবহুল প্রচুর বর্ণনা বঙ্কিমের প্রবন্ধে আকাশের তারার মতই ছড়িয়ে আছে ও আলো বিকিরণ করে যাচ্ছে। তিনি 'আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত' প্রবন্ধে বেশ কিছু বিস্ময়কর তথ্য ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশ করেছেন সৌর পদ্ধতি সম্পর্কে। তাঁর প্রবন্ধে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ বিদ্যমান :

১. পৃথিবীর ব্যাস ৭০৯১ মাইল।

২.পৃথিবীর ওজন ৬০৬৯০০০০০০০০০০০০০০০০০০ টন। এক টন সাতাশ মনের অধিক।

৩.পৃথিবীর তুলনায় সূর্য কত বৃহৎ? - ত্রয়োদশ লক্ষটি পৃথিবী একত্রিত করলে সূর্যের সমান হয়।

৪. পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব কত?- ৯১৬৭৮০০০ মাইল।

৫. পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব অনুভব করার জন্য তিনি একটি উদাহরণ প্রয়োগ করেছেন।

> 'যদি পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্যন্ত রেলওয়ে হইত, তবে কতকালে সূর্য্যলোকে যাইতে পারিতাম? উত্তর- যদি দিন রাত্রি ট্রেন অবিরত, ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে, তবে ৫২০ বৎসর ৬ মাস ১৬ দিনে সূর্য্যলোকে পৌছান যায়।'

৬. প্রফেসর ইয়ুঙ- এর আশ্চর্য্য সৌরৎপাত আবেক্ষণের বর্ণনা প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য একটি বিস্ময়কর ঘটনা। প্রফেসর ইয়ুঙ সূর্যের উপরিভাগে একখানি মেঘের মত পদার্থ দেখতে পান। পৃথিবী যেমন বায়বীয় আবরণ দ্বারা বেষ্টিত সূর্যেরও তেমনি। সূর্যের বায়ুমন্ডলে মেঘ ভাসছিল। হঠাৎ তিনি অবলোকন করেন নিচ থেকে উৎক্ষিপ্ত কোন ভয়ংকর বলের আঘাতে মেঘখন্ড ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। অতঃপর ঐ সূত্রাকার পদার্থগুলি অতি প্রবল বেগে উর্দ্ধে ধাবিত হচ্ছিল। এই বেগ প্রতি সেকেন্ডে ১৬৫ মাইল হয়। উৎক্ষিপ্ত পদার্থগুলির দৈর্ঘ্য ছিল ১ লক্ষ মাইলের বেশি।

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাশাপাশি গণিতশাস্ত্রেও বঙ্কিমের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। যদিও মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ্যা বঙ্কিমের সময়কালে সহজলভ্য ছিল না তথাপিও আলোচ্য প্রবন্ধে বঙ্কিমের চিন্তা ও দূরদর্শিতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর কল্পনা শক্তি ছিল আশ্চর্য রকমের সুদূরপ্রসারী।

আশ্চর্য সূর্যের মত আকাশে কত বিচিত্র নক্ষত্র বিদ্যমান? সুদৃশ্য প্রদীপমালা দ্বারা সজ্জিত আমাদের নিকটতম আকাশ। কোথাও কোন খুঁত নেই। আমাদের চোখ এক সময় ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে। ২য় প্রবন্ধ 'আকাশে কত তারা আছে?- এ প্রশ্নটি মহাকাশ বিজ্ঞানীদেরও ভাবিয়ে তোলে। প্রশ্নটি করা সহজ কিন্তু তার উত্তর প্রদান একজন বিজ্ঞানীর পক্ষেও সহজ নয়। মহাকাশে নক্ষত্রসকল যত্রতত্র ছড়ানো থাকে না। তারা একত্রে একটি গ্যালাক্সির অভ্যন্তরে বিস্তৃত দলের মধ্যে অবস্থান করে। যেমন- সূর্য মিল্কিওয়ে নামক গ্যালাক্সির অর্ন্তভুক্ত। জ্যোর্তিবিজ্ঞানীদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শুধুমাত্র মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সীতে ১০০ হাজার মিলিয়ন নক্ষত্র বিদ্যমান। সূর্য আমাদের ১০০ বিলিয়ন নক্ষত্রের ১টি নক্ষত্র। এরকম অন্যান্য গ্যালাক্সীসমূহেও মিলিয়ন মিলিয়ন নক্ষত্র রয়েছে। কাজেই আকাশে তারা গোনা আর সমুদ্রতীরে বালুকা রাশি গণনা একই সমান। আমরা যদি সমুদ্র তীরের একটি খন্ড বিভক্ত করে তার মধ্যেকার সমস্ত বালুরাশি গণনা করে আলাদা করি তাহলে গোটা সমুদ্র সৈকতের পরিমাণ সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করতে পারি। ঠিক এভাবেই গোটা মহাবিশ্বের মধ্যে একটি গ্যালাক্সির তারকা গণনা করে তারকারাজির একটা সংখ্যা অনুমান করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তথ্যসমৃদ্ধ এসব প্রবন্ধ মহাকাশ ও তারকারাজি সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে সক্ষম।

আলোচ্য প্রবন্ধে বঙ্কিম তারকারাজি এবং গ্যালাক্সি সমূহের বিশদ বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছেন। ফ্রেডারিখ উইলিয়াম হার্শেল একজন দক্ষ টেলিস্কোপ প্রস্তুতকারী। তিনি আকাশের তারকারাজি পর্যবেক্ষণ করেন। এই নীল নৈশ নভোমন্ডলে কী আছে, সে বিষয়ে গবেষণা করেছেন। বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধে সাহিত্যিক আবহ নির্মাণ করে নিয়ে তারপর বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। একজন পারঙ্গম সাহিত্যশিল্পীর জাতধর্ম অনুসারে তারকারাজি নিয়ে তাঁর বর্ণনা উল্লেখযোগ্য:

"পরিষ্কার চন্দ্রবিযুক্তা নিশিথে নির্ম্মল নিরমুদ আকাশমন্ডলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাই যে, আকাশে যেন নক্ষত্র আর ধরে না।..তারা সকল আকাশে শ্রেণীবদ্ধ এবং বিন্যস্ত নহে বলিয়াই আশু অসংখ্য বলিয়া বোধ হয়"

(আকাশে কত তারা আছে ? *বঙ্কিম রচনাবলী*,২য় খন্ড)[২০]।

মহাকাশ গবেষক উইলিয়াম হার্শেল আকাশের ২৫০ ভাগের এক ভাগ তারকা সংখ্যা গণনা করে নির্ণয় করেন- ৯০,০০০টি অর্থাৎ প্রায় এক লক্ষ তারা। সমস্ত আকাশে সাত কোটি সত্তর লক্ষ নক্ষত্র আছে। সেইরূপে সমগ্র আকাশ পর্যবেক্ষণ করে একজন জ্যোর্তিবিজ্ঞানীর ৮০ বৎসরকাল সময় প্রয়োজন। আকাশমন্ডলে তারকারাজি ছাড়াও রয়েছে বিচিত্র ছায়াপথ, নীহারিকা ও নেবুলা। এখানেও দেখি গ্যালাক্সি সমূহের বর্ণনার পূর্বে বঙ্কিম সাহিত্যরস সৃষ্টি করেছেন। মহাকাশের ছায়াপথের তুলনা তিনি 'এক স্থুল শ্বেত রেখা' দ্বারা নির্দেশ করছেন। স্যার উইলিয়াম হার্শেলের মতে কেবল ছায়াপথের মধ্যে ১,৮০,০০০০০ এক কোটি আশি লক্ষ তারা আছে। এসকল অবাক করা তথ্য তিনি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

নক্ষত্রের সংখ্যা গুণে শেষ হলে আসে নীহারিকার কথা। কোটি কোটি নক্ষত্রের মাঝখানে ধুম্রাকার পদার্থ দেখা যায় সেগুলোই নীহারিকা। এরূপ দূরদৃষ্ট তারাপুঞ্জময়ী নীহারিকা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটি নাক্ষত্রিক জগৎ। এ সকল আশ্চর্য ব্যাপার ভেবে চিত্ত বিহ্বল

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

হয়ে পড়ে। এই কোটি কোটি নক্ষত্র সকলই সূর্য। এ রকম প্রকান্ড তেজোময় কোটি কোটি সূর্য মহাকাশে বিচরণ করছে অবিরত। আকাশের বৃহৎ নক্ষত্রের নাম 'সিরিয়স', যা সূর্য থেকে ২৬৬৮ গুণ বড়। ছোটবড় অসংখ্য নক্ষত্র যা মহাভয়ংকর আকারবিশিষ্ট তেজোময় এই বিপুল বিশ্বব্রহ্মান্ডে অনবরত ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে।

৩য় প্রবন্ধের নাম 'ধূলা'। এই প্রবন্ধে অতি সূক্ষ্ম সামান্য পদার্থ 'ধূলা' সম্পর্কে বিস্তারিত সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন। বঙ্কিম আচার্য্য টিন্ডল সাহেবের (১৮২০-১৮৯৩) প্রস্তাব দ্বারা প্রভাবিত। টিন্ডল তাঁর 'ডাস্ট এন্ড ডিজিস'(১৮৭১)[৬১] প্রবন্ধে বলেন, 'In looking at the illuminated dust, we may ask ourselves what it is. How does it act, not upon a beam of light, but upon our own lungs and stomachs?' এ পৃথিবীর সর্বত্রই ধূলা পরিদৃষ্ট হয়। বঙ্কিম ধূলার অস্তিত্ব, ধূলার প্রকৃতি প্রভৃতি ধারণার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেন 'ধূলা' নামক প্রবন্ধে।

মহাকাশ পরিভ্রমণ সম্পর্কে বঙ্কিম খুব আগ্রহী ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন 'গগণ পর্য্যটন' শিরোনামে ৪র্থ প্রবন্ধ। আরো একটি বিস্ময়কর, রোমাঞ্চকর রচনা। সূক্ষ্ম প্রতিভার অধিকারী বঙ্কিমের রচনাভঙ্গী আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আকাশ পরিভ্রমণের প্রথম দিকের দিনগুলোর কথা।

বর্তমানে আমরা হাবল এবং জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের সাহায্যে মহাকাশ থেকে পৃথিবীর চিত্র ও মহাকাশের বিভিন্ন গ্যালাক্সির ছবি পর্যবেক্ষণ করি কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে।

অনন্ত আকাশ সম্পর্কে অতি সাধারণ ও সহজবোধ্য উদাহরণ প্রয়োগ সমৃদ্ধ বর্ণনা পাঠ করে আমাদের মত সাধারণ পাঠকদের বুঝে নিতে সামান্য বেগ পেতে হয় না। বঙ্কিম ইউরোপীয় জ্যোর্তিবিজ্ঞানীদের রচনা পাঠ করেছিলেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। ফরাসি বিজ্ঞানী মসুর ফনবিল মেঘদলের ভেতরে প্রবেশের যে বর্ণনা দিয়েছেন বঙ্কিম তা পাঠ করেছিলেন। আশ্চর্য শ্বেতবর্ণের ভাসমান মেঘদল দর্শনের চিত্রবৎ বর্ণনা দিয়েছেন বঙ্কিম। তৈরি হয়ে যায় একটি আশ্চর্য চিত্রকর্ম। সাহিত্যশিল্পী মুহূর্তেই হয়ে যান চিত্রশিল্পী। তিনি অবলোকন করেছেন:

> " শিরে এই গাঢ় নীলিমা–পদতলে, তুঙ্গ শৃঙ্গবিশিষ্ট পবর্বতমালায় শোভিত মেঘলোক– সে পর্ব্বতমালাও বাষ্পীয়– মেঘের পর্ব্বত–পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত,– কেহ বা কৃষ্ণ মধ্য, পাশ্বদেশ রৌদ্রের প্রভাবিশিষ্ট– কেহ বা রৌদ্রস্নাত, কেহ যেন শ্বেত প্রস্তর নির্মিত, কেহ যেন হিরক নির্ম্মিত। এই সকল মেঘের মধ্য দিয়া ব্যোমযান চলে।.. কোথাও বিদ্যুৎ চমকিতেছে, কোথাও ঝড় বহিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বরফ পড়িতেছে"(গগণ পর্য্যটন,*বঙ্কিম রচনাবলী*,২য় খন্ড)[২০]।

বঙ্কিম যখন এই 'গগণ পর্য্যটন' প্রবন্ধটি রচনা করেন তখন ব্যোমযান বা বিমানের আধুনিকতম ব্যবহার শুরু হয়নি। তা সাধারণের উপযোগী হয়ে উঠেনি। তদুপরি বঙ্কিম আকাশ পরিভ্রমণ সংক্রান্ত ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের রচনা পাঠ করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। এই একটি প্রবন্ধেই আমরা মসুর ফনবিল, গ্লেশর সাহেব, মসুর ফ্লামারিয়ঁ প্রমুখের নামোল্লেখ পাই। নিঃসন্দেহে বঙ্কিমের অধ্যয়নের জগৎ

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

ছিল বিস্তৃত ও সুপরিসর। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন সমগ্র বিশ্বজগৎময় বিচরণ করত। 'গগন পর্য্যটন' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানমনস্ক সংস্কৃতির পার্থক্য নির্দেশ করেছেন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কাহিনী অবতারণার মাধ্যমে।

কিন্তু এ বিশ্বজগৎ স্থির নয়। নিয়ত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে সবকিছুই চঞ্চল। বঙ্কিম এ বহুমাত্রিক জগতের একটি লেখনী চিত্র অঙ্কন করেছেন 'চঞ্চল জগৎ' নামের ৫ম প্রবন্ধে। জগতে কোন কিছুই গতিশূন্য নয়। আমাদের সাধারণের দৃষ্টিতে সবকিছুই স্থিরবৎ। কিন্তু গভীর অনুধাবনে বোধগম্য হয় যে গতিই জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা। এই পর্বত, এই ইমারত আপাত স্থির হলেও পৃথিবীর সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে একত্রে আবর্তন করছে একটি নির্দিষ্ট কক্ষ পথে। যেখানে চাঁদ পৃথিবীর নাগাল পায় না, সূর্য চন্দ্রের কক্ষপথ রোধ করে না। প্রত্যেকের কক্ষপথ আলাদা ও সুনির্দিষ্ট। সৃষ্টিকর্তার হুকুমের বাইরে কেউ যেতে পারে না। আমরা জানি সূর্যের তাপ শক্তির আধার। এই তাপ হল পরমাণুদের আন্দোলনের ফল। কাজেই জগতে কোন কিছুই গতিশূন্য নয় এই বৈজ্ঞানিক সূত্রের ব্যাখ্যা তিনি বিশ্লেষণ করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। বঙ্কিম বলেন,

'জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ দূরবীক্ষণিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হয়েছেন যে, পৃথিবী এবং তদসমুদয় গ্রহ-উপগ্রহাদি অত্যন্ত প্রখর বেগে ধাবমান মহাশূন্যে। পৃথিবীর এই গতির কারণ সূর্যের তাপ, আলোক, আকর্ষণ এবং বৈদ্যুতিক শক্তি। এই বিশাল আকৃতির র্সূয নক্ষত্র তার তাবৎ গ্রহমন্ডল নিয়ে (৯টি গ্রহ যা সূর্যে মোট ভরের অনুপাতের সমান) আকাশ মার্গে প্রতিনিয়ত ধাবমান। এই গতি শুনলে বিস্মিত হতে হয়। প্রতি সেকেন্ডে সুর্যের গতি ৪// মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৭১০০ মাইল। মহাকাশের একটি নাক্ষত্রিক প্রদেশকে হারকিউলিস নামকরণ করেছেন বিজ্ঞানীগণ। সূর্য তার মধ্যে অবস্থিত লামডা নামক নক্ষত্র অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে'(চঞ্চল জগত, *বঙ্কিম রচনাবলী*,২য় খন্ড)[২০]।

সূর্যের অভ্যন্তরে যে সকল বিস্ফোরণ ঘটছে তার একটি অবিশ্বাস্য বর্ণনা দিয়েছেন। নক্ষত্র এবং সূর্যের সম্পর্কে নানাবিধ চমৎকৃত তথ্য ও বক্তব্য পরিবেশন করেছেন তিনি। যার অধিকাংশই পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মতামত সংবলিত। যেমন- ডা. হুগিন্স, প্রক্টর সাহেবের মতামত তুলে ধরেছেন। সুর্যের অভ্যন্তরে সবসময় সৌর ঝড় অগ্নিবৃষ্টি, অগ্নি বিস্ফোরণ হচ্ছে। যার একটি বিস্ফোরণে আমাদের পৃথিবী এক নিমিষেই ধ্বংস হতে পারে। কাজেই সুর্যের ভেতরেও চাঞ্চল্য বিদ্যমান। অধিকাংশ নক্ষত্রে ততোধিক চাঞ্চল্য রয়েছে। সুর্যের মত অন্যান্য নক্ষত্রমন্ডলও প্রচন্ড বেগে ধাবিত হচ্ছে। বৃহৎ নক্ষত্র সিরিয়স প্রতি সেকেন্ডে ২০ মাইল বেগে এবং ঘণ্টায় ৭২০০০ মাইল বেগে মহাকাশে ধাবমান। এ সকল বিভিন্ন তথ্য, নক্ষত্রের গতিবেগ ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিম প্রকাশ করেছেন সাধারণ পাঠকদের জন্য।

সৃষ্টির আদি অনাদি সম্পর্কে মানুষের উৎকণ্ঠার শেষ নেই। মানব সৃষ্টির আদি লগ্নে পৃথিবীর কী রূপ বিদ্যমান ছিল তা নিয়েও মানুষের কৌতুহলের শেষ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজ্ঞানের এক বৃহৎ অর্জন হল মানুষের জন্মলগ্নের রহস্য আবিষ্কার। মানুষের উদ্ভবকাল নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে আসছে এই বিতর্ক। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিজ্ঞানীরা নানা প্রমাণ যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করতে সমর্থ হন তাদের মতের সপক্ষে। ভুতাত্ত্বিক প্রমাণ সম্বলিত মানুষের উদ্ভব নিয়ে ব্রিটিশ জিওলজিস্ট চার্লস লিয়েল ১৮৬৩ সালে *Geological Evidences of the Antiquity of Man* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বঙ্কিম গ্রন্থটির অনুসরণে ৬ষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা করেছেন তার নাম 'কত কাল মনুষ্য?'। ভূতাত্ত্বিক হার্বাট স্পেন্সারের মতবাদ আলোচনা করে বঙ্কিম লিখেছেন মানুষ সর্বশেষ স্তরের জীব এবং সর্বাপেক্ষা আধুনিক জীব। পৃথিবীর অভ্যন্তরে স্তরে স্তরে যে মৃত্তিকা ও 'ফসিল'

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করে মানুষের উদ্ভবকাল নির্ণয় করেছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের ধারণা আনুমানিক ৫০০ কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি। তবে পৃথিবীর বয়সের তুলনায় মানুষের বয়স ক্ষীণ। এই প্রবন্ধে তিনি পৃথিবীর রূপান্তর প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী লাপ্লাসের মতবাদ আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন:

> "যে সকল কারণে বৃষ্টি বিন্দু গোলত্বপ্রাপ্ত হয়, সেই সকল কারণে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই ঘূর্ণিত বিযুক্ত ভগ্নাংশ, গোলাকার প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে এক একটি গ্রহের উৎপত্তি। তাহা হইতে উপগ্রহগণেরও ঐরূপে উৎপত্তি। অবশিষ্ট মধ্যভাগ, সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান সূর্য্যে পরিণত হইয়াছে" (কতকাল মনুষ্য? *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খন্ড)[২০]।

জীব গঠনের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে বঙ্কিমের ধারণা ছিল। জীবের মৌলিক উপাদান সমূহ নিয়ে বঙ্কিম প্রচুর অধ্যয়ন করেছেন। জৈবনিকের চারটি উপাদান সম্পর্কে বলেছেন ৭ম প্রবন্ধ 'জৈবনিক' এ। জলজান, অম্লজান, অঙ্গারজান, যবক্ষারজান-এই চারটি উপাদানের কথা বলেছেন। ইউরোপীয় বিজ্ঞানী হাক্সলী রচিত 'লে সারমনস' (১৮৭০)[৪৯] অনুসরণে প্রবন্ধটি রচিত। সরস ভঙ্গীমায় তিনি পুনরায় ভারতীয় হিন্দু দর্শনকে বিদ্রুপ করেন 'জৈবনিক' প্রবন্ধে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের পার্থক্য কোথায় তা তিনি বিজ্ঞ বিচারকের ন্যায় বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি বিদ্রুপ করে বলেন,

'ক্ষিতি, অপ, তেজং, মরুৎ এবং আকাশ, বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে ভৌতিক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাহারাই পঞ্চভূত-আর কেহ ভূত নহে। এক্ষণে ইউরোপ হইতে নতুন বিজ্ঞানশাস্ত্র আসিয়া তাহাদিগকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়াছেন। ভূত বলিয়া আর কেহ তাহাদিগকে বড় মানে না' (জৈবনিক, *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খন্ড)[২০]।

'পরিমাণ রহস্য' শিরোনামে ৮ম প্রবন্ধে তিনি সমুদ্রের গভীরতার পরিমাণ, শব্দ, জ্যোতিস্তরঙ্গ, সমুদ্রতরঙ্গ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। 'পরিমাণরহস্য' প্রবন্ধে গ্রহ নক্ষত্রের সংখ্যা বিভিন্ন পদার্থের পরিমাণ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি আকাশে তারার সংখ্যা গুণে পরিমাপ করা যায় কিন্তু নীহারিকার অভ্যন্তরে তারকার সংখ্যা গোনা যায় না। অঙ্ক সেখানে হার মানে। যেমন- বিশাল সমুদ্র তীরে বালুকারাশি। প্রকান্ড এই বিশ্বজগতের আকার অননুমেয়। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেছেন সমুদ্রের গভীরতা গড়ে ৫.১২ মাইল, শব্দের গতি প্রতি সেকেন্ডে ১০৩৮ ফিট । এই শব্দকে তারের মাধ্যমে পাঠানোর বিষয়টিও বঙ্কিম আমাদের ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে। পরিমাণ রহস্য প্রবন্ধে উইলিয়াম হার্শেল, মসুর পুইলা, পাদরি ডাক্তার স্কোরেসবি, পল্টন সাহেব, ডক্টর টমাস টমসন, হাম্বল্ট, আচার্য হটন, লাপ্লাস প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও শব্দ প্রবন্ধে বেথের্ম, ব্রেগেট নামক বিজ্ঞানবিদ, মাশার্স, লেপ্টেনান্ট ফস্টর, ফিণ্ডলে, স্কোরেসবি প্রমুখ বিজ্ঞানীদের নাম উল্লেখ পাচ্ছি।

সর্বশেষ ৯ সংখ্যক প্রবন্ধ 'চন্দ্রালোক'। বেয়র, মাল্লর নামক জ্যোতির্বিদের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। 'চন্দ্রালোক' প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তিনি চন্দ্র সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিয়েছেন। কবির চোখে চাঁদের রূপ আর বাস্তবতা ভিন্ন। এ বিষয়ে ধর্মীয় কুসংস্কার পরিত্যাগ করার সময় আসন্ন। এই চাঁদের সঙ্গে সুন্দর মুখগুলোর তুলনা হাস্যকর।

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

'চন্দ্রপৃষ্ঠ সহস্র বিবরবিশিষ্ট, কেবল পাষাণময়, বিদীর্ণ, ভগ্ন, ছিন্নভিন্ন, দগ্ধ অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়'(চন্দ্রালোক *বঙ্কিম রচনাবলী*,২য় খন্ড)[২০]।

সবশেষে প্রবন্ধ পর্যালোচনায় বলতে পারি, বঙ্কিম রচিত 'বিজ্ঞানরহস্য' প্রবন্ধসমূহ ইউরোপীয় বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর যুক্তিবাদী, দার্শনিক সত্তা বিজ্ঞানকে আঁকড়ে সমাজের কল্যাণে জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন। আমরা জানি যৌক্তিক কারণ ও সঠিক বাস্তবতা নিয়ে বিজ্ঞান গড়ে উঠে। কুসংস্কার ও অযৌক্তিক বিশ্বাস বিজ্ঞানের বিপরীত মেরুতে বসবাস করে। সাহিত্যিক কল্পনা আর বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষের কল্পনা যাকে গ্রহণযোগ্য বিশ্বাসে পরিণত করে প্রশান্তি এনে দেয় বিজ্ঞান সেটাকে ধূলিস্মাৎ করে মুহুর্তেই। প্রমাণ ব্যতীত কিছু না মানবার প্রবণতার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞান বিষয়ক এই প্রবন্ধগুলিতে।

৭. প্রবন্ধের ভাষা বিশ্লেষণ

ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বাংলা ভাষার বিকাশে বঙ্কিমের আধুনিক উদার ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন অনেকে (মজিদ, ১৯৮৯)[২৬]। বঙ্কিমের সময় মোটামুটি বাংলা গদ্য প্রতিষ্ঠিত। প্রবন্ধ রচনায় তিনি সাধুরীতির অপেক্ষাকৃত সরলরূপ ব্যবহার করেছেন। যে কোনো সাহিত্য মাধ্যম পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ভাষাশৈলীর স্বরূপ অন্বেষণ একটি অনিবার্য প্রত্যয়। ব্যাকরণিক উপাদানের কাঠামোর নিরিখে বিশ্লেষণ মুখ্য বিষয় নয়। তবে ভাষাবিজ্ঞানগত প্রকরণের কিছু শর্ত পূরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। বিজ্ঞানরহস্য প্রবন্ধের ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান ব্যবহারে বঙ্কিমের দক্ষতা প্রশংসনীয়। এ প্রবন্ধে তিনি শব্দ ব্যবহারে, চিত্রকল্প, বাক্য, অনুচ্ছেদ নির্মাণে যে কৌশল প্রয়োগ করেছেন, তা বিশ্লেষণ করলে শৈলীর বিষয়টি বিশ্লেষণযোগ্য প্রমাণিত হয়। প্রথমেই আমরা শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করি।

শব্দ হলো একটি ভাষার প্রধান উপাদান। শব্দপ্রয়োগে প্রবন্ধের বক্তব্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। বঙ্কিমের শব্দ প্রয়োগ এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শব্দের প্রয়োগ বৈচিত্র্য পাঠককে মুগ্ধ করে। প্রবন্ধে সাধুরীতির ব্যবহার বেশ প্রাঞ্জল ও সাবলীল। তৎসম শব্দের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। বিদেশি শব্দের ব্যবহার নেই বললেই চলে, কেবল ইংরেজি কিছু শব্দ রয়েছে যা নিতান্তই প্রাসঙ্গিক। তিনি যতটা সম্ভব বিদেশি শব্দের বাংলা পরিভাষা ও অর্থ ব্যবহার করেছেন। কেবল বিদেশি নামগুলো ব্যবহার করেছেন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে।

মহাকাশ সংক্রান্ত বিবিধ প্রসঙ্গে তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার রয়েছে প্রচুর। যেমন- সঙ্কোচপ্রাপ্ত (সংকুচিত), ঘূর্ণিত বিযুক্ত ভগ্নাংশ, বিজ্ঞান-দৈত্য, গোলত্বপ্রাপ্ত (গোলাকার), প্রচন্ড বাত্যার কল্লোল, কর্ণবিদারক অশনিসম্পাতশব্দ, ভীমতর কোলাহল, দূরবীক্ষণিক অনুসন্ধান, নাক্ষত্রিক প্রদেশ, অর্ণবযানসকল, চন্দ্রবিযুক্তা নিশিথে, নির্ম্মল নিরমুদ আকাশমন্ডল, চিত্রিতবৎ, আকাশমার্গ, ব্যোমযান, মেঘগর্ভস্থ রন্ধ্র, হ্রস্বতেজা, চন্দ্রদেব ইত্যাদি ছাড়াও আরো অনেক শব্দের সমারোহ প্রবন্ধে লক্ষ্য করা যায়।

বৈজ্ঞানিক শব্দ বা বাংলা পরিভাষা: তবে বঙ্কিম যখন এ প্রবন্ধ রচনা করেন তখন বাংলা প্রবন্ধ রচনার জন্য যথেষ্ট বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা তৈরি ছিল না। আলোচ্য প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্মাণে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সাধুভাষায় লিখিত এ প্রবন্ধগুলোতে অসংখ্য পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করেছেন তিনি। প্রবন্ধের আলোচনায় নানারকম বিদেশি শব্দের বাংলা পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- মেডিটারেনিয়ান মানে ভূমধ্যস্থ, মেটেরিয়ালিজম-প্রকৃতিবাদ, অম্লজান, অঙ্গারজান, ইথার, জ্যোতিস্তরঙ্গ,

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

লামডা নক্ষত্র, আলফা সেন্টরাই, বেগা, বিটা, গামা প্রভৃতি শব্দ ছাড়াও অনেক শব্দ লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি প্রবন্ধের নামকরণে আমরা পরিভাষার ব্যবহার দেখি। যেমন- Great solar Erruption- আশ্চর্য সৌরৎপাত, Multitudes of stars- কত তারা আকাশে, Dust-ধূলা, Aerostation- গগন পর্যটন, Universe in motion-চঞ্চল জগৎ, Antiquity of man- কত কাল মনুষ্য, Protoplasm- জৈবনিক, Curiosities of quantity and measure- পরিমাণ রহস্য, The Moon- চন্দ্রালোক, Occultation-সমাবরণ প্রভৃতি। এভাবে তিনি বিদেশি শব্দগুলোর বাংলা পারিভাষিক শব্দ তৈরী করে সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তবে সাধুরীতির যুগে বিজ্ঞান বিষয়ক শব্দগুলোকে তিনি আশ্চর্য রসাত্মক ও সাবলীল ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমের ভাষারীতি ও রচনাকৌশল সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র বাগল (২০১৮)[২১] লিখেছেন,'মনন-সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে- সাহিত্য ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য-সমালোচনা, ধর্মতত্ত্বালোচনা- নানা দিকেই তাঁর কৃতিত্ব অসামান্য। সত্যকার ক্লাসিক্সের যাবতীয় গুণ তাহার রচনার মধ্যে রহিয়াছে।' পারিভাষিক বঙ্গানুবাদগুলি লক্ষ্য করলে আমরা তার প্রমাণ পাই।

বাক্য ভাষার বৃহত্তম উপাদান। প্রবন্ধে বাক্য বন্ধন প্রকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাহুল্যতা পরিত্যাজ্য। বঙ্কিমের বাক্য ব্যবহারে সঙ্গতি লক্ষণীয়। দীর্ঘ ও জটিল বাক্যের পাশাপাশি সরল বাক্যও ভারসাম্য রক্ষা করেছে। সরল, জটিল ও যৌগিক **বাক্যের উদাহরণ:**

(ক) বিজ্ঞান- দৈত্য সকল পথ ঘেরিয়া বসিয়া আছে। আজি চন্দ্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়াছাড়ি নাই।

(খ) প্রচন্ড বাত্যার কল্লোল অথবা কর্ণবিদারক অশনিসম্পাতশব্দ হইতে লক্ষ লক্ষ গুণে ভীমতর কোলাহল অনবরত সেই সৌরমন্ডলে নির্ঘোষিত হইতেছে সন্দেহ নাই।

(গ) জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ দূরবীক্ষণিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হয়েছেন যে, পৃথিবী এবং তদসমুদয় গ্রহ-উপগ্রহাদি অত্যন্ত প্রখর বেগে ধাবমান মহাশূন্যে।

(ঘ) ভারতবর্ষবাসীরা মধ্যস্থ। মধ্যস্থেরা তিন শ্রেণীভূক্ত।

(ঙ) জৈবনিক জীব-শরীর মধ্যেই পাওয়া যায়, অন্যত্র পাওয়া যায় না। জীব শরীরে কোথা হইতে জৈবনিক আইসে? জৈবনিক জীব শরীরে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চিত্রকল্প নির্মাণেও বঙ্কিমের দক্ষতা লক্ষণীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিমের বর্ণনা ভঙ্গি আমাদের সামনে অপরূপ চিত্রকর্ম তুলে ধরে। এই প্রবন্ধ পাঠে আমরা মহাকাশ বিস্ময়ের এক আশ্চর্য জগতে প্রবেশ করি। বস্তুত এই পৃথিবী নামক গ্রহের আকাশ অতি নিবিড় নীল। কিন্তু মাহাকাশ বা মহাশূন্য মূলত অন্ধকার। তার বর্ণ গভীর কৃষ্ণবর্ণ। এই কৃষ্ণবর্ণের একটি তুলনা প্রসঙ্গে তিনি এক অপূর্ব চিত্রকল্প নির্মাণ করেন। বঙ্কিম লিখেছেন :

"অমাবস্যার রাত্রে প্রদীপশূন্য গৃহমধ্যে সকল দ্বার ও গবাক্ষ রূদ্ধ করিয়া থাকিলে যেরূপ অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের প্রকৃত বর্ণ তাহাই। তন্মধ্যে স্থানে স্থানে নক্ষত্রসকল প্রচন্ড জ্বালাবিশিষ্ট"(গগন পর্য্যটন, *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খন্ড)[২০]।

আধুনিক মহাকাশবিজ্ঞানের আবিষ্কার অনুযায়ী তিনি বর্ণনা দিয়েছেন আমাদের বাসযোগ্য এ নীল গ্রহ পৃথিবীর। উর্দ্ধলোক থেকে পৃথিবীর চিত্র কিরূপ তার একটি আশ্চর্য মনোমুগ্ধকর চিত্রকল্প অঙ্কন করেছেন। আকাশ থেকে পৃথিবীর অসাধারণ সৌন্দর্য

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

অবলোকনের বর্ণনাও প্রদান করেন তিনি। চলচ্চিত্রের মতই গতিশীল। নির্মাণ করেছেন অসাধারণ চিত্রকল্প। শিল্পীর তুলির আঁচড়ে নিমেষেই আঁকা ছবি আমাদের দৃশ্যমানজগত। বঙ্কিমের অসাধারণ শিল্পীমন ভালবাসে এই নীল আকাশ-সাদা মেঘ, সবুজ পৃথিবী। তাঁর বর্ণনায়:

> " ব্যোমযান অল্প উচ্চ গিয়াই মেঘসকল বিদীর্ণ করিয়া উঠে। মেঘের আবরণে পৃথিবী দেখা যায় না, অথবা কদাচিৎ দেখা যায়। পদতলে অচ্ছিন্ন, অনন্ত দ্বিতীয় বসুন্ধরাবৎ মেঘজাল বিস্তৃত। এই বাষ্পীয় আবরণে ভূগোলক আবৃত; যদি গ্রহান্তরে জ্ঞানবান জীব থাকে, তবে তাহারা পৃথিবীর বাষ্পীয়াবরণই দেখিতে পায়; পৃথিবী তাহাদিগের প্রায় অদৃশ্য।.. ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখা যায়, তখন উহা বিস্তৃত মানচিত্রের ন্যায় দেখায়; সর্বত্র সমতল– অট্টালিকা, বৃক্ষ, উচ্চভূমি এবং অল্পোন্নত মেঘও, যেন সকলই অনুচ্চ, সকলই সমতল, ভূমিতে চিত্রিতবৎ দেখায়। নগরসকল যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঠিত প্রতিকৃতি, চলিয়া যাইতেছে বোধ হয়। বৃহৎ জনপদ উদ্যানের মত দেখায়। নদী শ্বেত সূত্র বা উরগের মত দেখায়। বৃহৎ অর্ণবযানসকল বালকের ক্রীড়ার জন্য নির্ম্মিত তরণীর মত দেখায়"(গগন পর্য্যটন, *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খন্ড)[২০]।

বঙ্কিমের 'বিজ্ঞানরহস্য' প্রবন্ধ ভাষাগত উৎকর্ষের দিক থেকেও বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

৮. বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও মতবাদ প্রয়োগ:

আলোচ্য প্রবন্ধে সমসাময়িক ইউরোপীয় বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মতবাদ ও তাঁদের অবদানের বিবরণ উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধে উল্লিখিত ঊনবিংশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের পরিচয় দেয়া হলো। যেমন-চার্লস অগাস্টাস ইয়ুঙ (১৮৩৪-১৯০৮) একজন আমেরিকান জ্যোতির্বিদ, যিনি প্রথম সৌরোৎপাত আবেক্ষণ করেন ১৮৭২ সালে । এটা সূর্যের চৌম্বকীয় ঝড় হতে পারে। এছাড়াও তিনি সূর্য গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করেন ১৮৬৯ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত । 'আশ্চর্য সৌরৎপাত' প্রবন্ধে বঙ্কিম প্রফেসর ইয়ুঙ এর সৌরৎপাত আবেক্ষণের বর্ণনা দেন। তিনি সূর্যকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে স্পেট্রোস্কপি নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর। যার মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ছিল- *Manual of Astronomy*(১৮৮৮)[63] । বঙ্কিমের ৩য় প্রবন্ধ 'ধূলা' আচার্য্য টিন্ডলের (১৮৭১)[61] *Dust and Disease* প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করে রচিত। চার্লস ব্যারোনেট লেইল (১৭৯৯-১৮৭৫) একজন প্রথিতযশা স্কটিশ জিওলজিস্ট। বঙ্কিম তাঁর লেখা *Antiquity of Man* (১৮৬৩)[৫৩] বইটি পড়েছিলেন। 'কত কাল মনুষ্য' প্রবন্ধটি বিজ্ঞানী লেইল এর গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। স্যার জোসেফ নরম্যান লকিয়ের (১৮৩৬-১৯২০) একজন ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তিনি ১৮৬৮ সালে সূর্যের পরিমন্ডলে একটি নতুন উপাদান খুঁজে পান যার নাম দেন হিলিয়াম। গ্রীক শব্দ 'হিলিওস' মানে সূর্য। তিনি ১৮৮৫ সালে প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন রয়েল কলেজ অব সাইয়েন্স-এ। প্রভাবশালী পত্রিকা *Nature* (১৮৬৯) এর প্রতিষ্ঠাতা এবং আজীবন এর সম্পাদক ছিলেন। ফ্রেডরিখ উইলিয়াম হার্শেল (১৭৮৮-১৮২২) জার্মান ইংলিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী। হার্শেল ছিলেন একজন দক্ষ টেলিস্কোপ প্রস্তুতকারক এবং বাইনারী তারকা সম্পর্কে তার গবেষণা ছিল পথিকৃতের । তিনি দীর্ঘ ৯ বৎসর মহাকাশ জরিপ করে ডাবল স্টার অনুসন্ধান করেন। নেবুলা সম্পর্কেও তিনি বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি সৌর জগতের গ্রহ ইউরেনাস আবিষ্কার করেছেন। তিনি তারকা এবং নেবুলার সন্ধান পান। তারকারাজি বন্টন করে তিনি

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

অধ্যয়ন করেন। হার্শেল সর্বপ্রথম আমাদের গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ে'র সাধারণ কাঠামো গঠন করেন এবং তিনি মিল্কিওয়ে আবিষ্কার করেন। তিনি ১৮২২ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তার একমাত্র পুত্র জন হার্শেল পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন। উইলিয়াম হার্শেলের পুত্র জন হার্শেল। পিতার সাথে কাজ করেন। তিনি প্রতিফলিত টেলিস্কোপ তৈরি করে ১৮১৬ সালে জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি রয়েল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির (১৮২০) একজন প্রতিষ্ঠাতা। হার্শেল ১৮৬৪ সালে তারকা পর্যবেক্ষণের তালিকা প্রকাশ করেন। তারকাজগত এবং নেবুলা নিয়েই তার কাজ বেশি। নিকোলাস ক্যামিলি ফ্লামেরিয়ন (১৮৪২-১৯২৫) একজন ফরাসী জ্যোতির্বিদ। জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি অনেক লিখেছেন। তিনি একটি ম্যাগাজিন বের করেন- *L' Astronomie* (১৮৮২) এই শিরোনামে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানী হাক্সলীর বিজ্ঞানচিন্তা দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। বঙ্কিম তাঁর ৭ম প্রবন্ধ 'জৈবনিক' প্রবন্ধটি হাক্সলে রচিত 'লে সারমনস' অনুসরণে লিখেছেন। জৈবনিক প্রবন্ধে তিনি বলেন, 'এই চঞ্চল, সুখদুঃখবহুল বহুস্নেহাস্পদ জীবন কেবল জৈবনিকের ক্রিয়া, রাসায়নিক সংযোগ সমবেত জড় পদার্থের ফল। নিউটনের বিজ্ঞান, কালিদাসের কবিতা, হমবোল্ট বা শংকরাচার্যের পান্ডিত্য-সকলেই জড় পদার্থের ক্রিয়া, শাক্যসিংহের ধর্ম্মজ্ঞান, আকবরের শৌর্য্য, কোমতের দর্শনবিদ্যা, সকলেই জড়ের গতি.. জৈবনিক ভিন্ন ভিতরে আর ঐন্দ্রজালিক কেহ নাই।'

থমাস হেনরি হাক্সলি (১৮২৫-১৮৯৫) একজন ইংরেজ জীববিজ্ঞানী। তিনি চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ নিয়ে কাজ করেছেন। ১৮৬০ সালে তাঁর বিবর্তন বিষয়ক বিতর্ক বক্তৃতা তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। বৃটিশ প্রকৃতিবাদী চার্লস রবার্ট ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) মতবাদ ছিল নতুন প্রজাতি প্রাকৃতিকভাবে উদ্ভুত হয় একটি বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ফরাসি জ্যোতির্বিজ্ঞানী মারকুইস ডি লাপলাস (১৭৪৯-১৮২৭) ১৭৯৬ খিস্টাব্দে সৌরজগতের উৎপত্তি সংক্রান্ত তার নীহারিকা মতবাদ প্রকাশ করেন। পৃথিবীর রূপান্তর বিষয়ে মতবাদটি তার *Exposition of solar system* (1796)[52] গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এটিকে বলা হয় নীহারিকা মতবাদ বা Nebular Hypothesis. ঊনিশ শতকের ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন(১৮০৯-১৮৮২) প্রকৃতির বিবিধ বিষয়কে বিজ্ঞানের মাত্রায় বুঝে নিতে ঐতিহাসিক প্রকৃতি অভিযান চালিয়েছিলেন। তাঁর আবিষ্কৃত বিবর্তনবাদের প্রবক্তা হিসেবে ডারউইনের নাম ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। বিবর্তনবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে ডারউইন পৃথিবীর নানা প্রান্ত ঘুরেছেন। পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন প্রকৃতির নিয়মে বিবর্তনবাদের প্রভাবেই এই জীবজগতের সব প্রাণী ও উদ্ভিদের আবির্ভাব ও বিলুপ্তি ঘটেছে (মিত্র, ২০০৯)[৩০]। ভূতাত্ত্বিক হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩) -এর মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বঙ্কিম। বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধে বলেন,'যাহারা বিজ্ঞানালোচনায় সক্ষম, তাঁহারা এই নৈহারিক উপপাদ্য সম্বন্ধে হর্বট স্পেন্সারের বিচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।.. স্পেন্সারের সকল কথাগুলি প্রামাণিক না হইলে হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির কৌশল আশ্চর্য্য' (কত কাল মনুষ্য? *বঙ্কিম রচনাবলী*, ২য় খন্ড)[২০]। হার্বার্ট স্পেন্সার একজন ইংরেজ দার্শনিক, জীববিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানী। তিনি লাপলাসের নীহারিকা মতবাদ নিয়েও নিজস্ব মতবাদ প্রদান করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট কোঁতের দৃষ্টবাদী দর্শনের প্রয়োগ করেন। তিনি তার ভাবশিষ্য। তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শাখাগুলোর মধ্যে জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তার অভিমতে ডেভিড হিউম, ইমানুয়েল কান্ট, স্টুয়ার্ট মিলের প্রভাব আছে। আরো অসংখ্য বিজ্ঞানীদের নাম ও অবদানের কথা বঙ্কিম স্বীকার করেছেন তাঁর প্রবন্ধে।

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

ইংরেজ দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) হিতবাদী দর্শন প্রচার করেন। এই দর্শনের মূল লক্ষ্য হল অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ হিত বা মঙ্গল সাধন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে হিতবাদী এর প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট (বাগল, ১৪১৭)[২০]। যদিও শেষ জীবনে তার ধারণার পরিবর্তন ঘটেছিল। তথাপিও হিতবাদী সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। 'বিজ্ঞানরহস্য' রচনায় তার এই হিতবাদী দর্শনের কার্যকরী রূপ দেখতে পাই। প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য ছিল সমাজের হিতসাধন।

ফ্রান্সের দার্শনিক অগাস্ট কোঁত (১৭৯৮-১৮৫৭) এর 'পজিটিভ ফিলোজফি' যার অর্থ ধ্রুববাদী দর্শন। কোঁত সমাজকে মানবদেবী রূপে কল্পনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও এই দর্শন পূর্ণরূপেই গ্রহণ করেছিলেন (বাগল, ১৪১৭)[২০]। হিতবাদী ও ধ্রুববাদী মানসিকতা থেকেই বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলো রচিত হয়েছে। মানব সেবাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য। সমাজের উন্নয়নকল্পে তিনি কলম ধারণ করেছেন।

মূলত পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব ও আধুনিক মতবাদ বঙ্কিম পাঠ করেছেন এবং মানব কল্যাণে প্রবন্ধ রচনায় তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যৌক্তিক কারণ ও সঠিক বাস্তবতা নিয়ে বিজ্ঞান গড়ে উঠে। কুসংস্কার ও অযৌক্তিক বিশ্বাস বিজ্ঞানের বিপরীত মেরুতে বসবাস করে। *বিজ্ঞান রহস্যের* অর্ন্তগত সর্বশেষ প্রবন্ধ 'চন্দ্রালোক' এ তিনি বলছেন, 'সাহিত্যিক কল্পনা আর বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষের কল্পনা যাকে গ্রহণযোগ্য বিশ্বাসে পরিণত করে প্রশান্তি এনে দেয় বিজ্ঞান সেটাকে ধুলিস্মাৎ করে মুহুর্তেই'। বিজ্ঞান রহস্য গ্রন্থের প্রতিটা প্রবন্ধেই বঙ্কিম ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের নানাবিধ মতবাদ ও তাত্ত্বিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তাদের আবিষ্কারসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন, মতবাদের সাথে সহমত পোষণ করেছেন। বিপুল সংখ্যক (প্রায় অর্ধশত) বিজ্ঞানীর নাম, তাদের আবিষ্কার, গ্রন্থের উল্লেখ ও তথ্যাদি তিনি প্রয়োগ করেছেন প্রবন্ধগুলোর বিষয় বিশ্লেষণে। এই সকল বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিদ, পদার্থবিদ, ভূতাত্ত্বিক, প্রকৃতিবিদ, দার্শনিক, জীববিজ্ঞানী, গণিতবিদ, সমাজতাত্ত্বিক প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানচর্চা করেছেন।

৯. প্রবন্ধ লেখকের মানসিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণঃ

বঙ্কিম প্রেসিডেন্সি কলেজের(১৮১৭) ছাত্র ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের(১৮৫৭) প্রথম গ্রাজুয়েট। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে প্রসঙ্গতই বঙ্কিমের মনে বিজ্ঞানের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল। বেশ কিছু উদ্ভাবনী তথ্যসূত্রও তিনি প্রদান করেন বিজ্ঞানরহস্য প্রবন্ধে। লেখকের মানসে সমকালীন পাশ্চাত্য মনীষী ও বিজ্ঞানীদের প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। ফরাসি বিপ্লবের মূল মন্ত্র সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা দ্বারাও বঙ্কিম অনেকাংশে পরিচালিত হয়েছেন। প্রথম জীবনে বঙ্কিমের চেতনায় ইউরোপীয় বিপ্লব, বেন্থামের হিতবাদী দর্শন, অগাস্ট কোঁত এর ধ্রুববাদী দর্শন প্রভাব বিস্তার করে। সাহিত্য চর্চায় লেখকের মানসিকতা ছিল মূলত সমাজসেবা। ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে কুসংস্কারমুক্ত করা এবং জ্ঞান সাধনায় আলোকিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আলোকে এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে মুক্তির পথ দেখানো। যে কারণে বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধে বিভিন্ন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের মতবাদ ও আধুনিক তত্ত্ব শাসিত ধ্যান ধারণা প্রয়োগ করেছেন। 'বিজ্ঞান রহস্যে'র প্রতিটি প্রবন্ধেই তিনি বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ও প্রাসঙ্গিক মতবাদ যথাস্থানে উল্লেখ ও উদাহরণ সহযোগে বিশ্লেষণ করেছেন।

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

ঊনবিংশ শতকের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালি ভারতীয় সমাজের ভ্রান্ত ধারণার মর্মমূলে বঙ্কিম কষাঘাত করেছেন। প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচনেও তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণ আপাত কৌতুহলের বিষয়কে অত্যন্ত লঘু চালে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করেছেন। বঙ্কিম বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞানের সঠিক ব্যবহার ভারতীয় সমাজকে কুসংস্কার ও অযৌক্তিক মানসিকতা দূর করতে সাহায্য করবে। সমাজসেবা ও ভারতবর্ষে উন্নয়নে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ এবং তারই ফলে আমরা বাংলা ভাষায় বেশ কিছু জনপ্রিয় বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ পেয়েছি।

১০.পাঠকের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ:

সাহিত্যের উদ্দেশ্য পাঠকের হিতসাধন। পাঠক এবং লেখকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন না হলে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। পাঠকসমাজের মৌলিক সমস্যা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে সক্ষম। একজন লেখক পাঠককে উদ্দেশ্য করে লেখেন। পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তিনি পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছে যান। ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী মাইকেল হ্যালিডে (১৯২৫-২০১৮) সাহিত্যে ভাষার ক্রিয়াশীলতাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। লেখককেন্দ্রিক, পাঠককেন্দ্রিক, চরিত্রকেন্দ্রিক (N. and others, 1992)[59]। প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাষার ক্রিয়াশীলতা লেখককেন্দ্রিক ও পাঠককেন্দ্রিকও বটে। প্রবন্ধের বিষয় পাঠকহৃদয়ের কতটা গভীরতল স্পর্শ করতে সক্ষম তার উপর অনেকটা নির্ভর করে প্রবন্ধের শিল্পসফলতা। কাজেই প্রবন্ধ পর্যালোচনা, উপস্থাপনার কৌশল, কাঠামো, ভাষারীতি, প্রভৃতির সঙ্গে পাঠক প্রতিক্রিয়াও যুক্ত করা যায়। সমালোচকের সহযোগিতায় ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক সময় খন্ডিত। পাঠকের সাথে যে সাহিত্যের সম্পর্ক গভীর তার প্রতিক্রিয়া ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে পাঠক প্রতিক্রিয়া কতটা ফলপ্রসূ তা বিবেচনাধীন। পাঠক হৃদয়ে কতটা প্রভাব সঞ্চারী তার উপর নির্ভর করছে সাহিত্যমান। প্রবন্ধের কোন আদর্শ শিল্পরূপ নেই। প্রবন্ধ রচনায় লেখকের স্বাধীনতা পর্যাপ্ত। বিজ্ঞান নির্ভর প্রবন্ধ পাঠের লেখক সীমিত হবে সন্দেহ নেই। তথাপি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত পাঠকগোষ্ঠীর কল্যাণে 'বিজ্ঞানরহস্য' প্রবন্ধটি উৎসর্গীকৃত। প্রবন্ধটি পাঠের পর খুব সহজেই এই শ্রেণীর পাঠকেরা লেখকের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন। শিক্ষিত নারী মহল ও শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণ সচেতন জনগণের জন্যই এই প্রবন্ধগুলো উপস্থাপিত। তারা তাদের ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাতে সক্ষম হবেন। এ প্রসঙ্গে *বঙ্গদর্শনের* ভূমিকায় বঙ্কিম বলেন, 'লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে আলোচিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল সাধারণ বাঙালী পাঠক, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকেরা এবং আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী স্ত্রী বুঝিতে পারেন। কতদূর এ উদ্দেশ্য সফল হইবে বলিতে পারি না'(দ্রষ্টব্য: বাগল, ১৪১৭)[২০]। বঙ্কিমের এ ধরণের সংশয়োক্তির পরও আমরা দেখি 'বিজ্ঞানরহস্য' প্রকাশের ৬৫ বছর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৭ সালে একই ধারায় 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি গ্রন্থটির কোথাও বঙ্কিমের গ্রন্থের উদ্ধৃতি বা নামোল্লেখ করেননি। তথাপিও বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র যেমন উনিশ শতকে, রবীন্দ্রনাথ তেমনি বিশ শতকে নিষ্ঠাবান লেখকদের প্ররোচিত করার জন্য সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার ছাঁচ গড়ে দিতে চেয়েছেন (রায় ও অন্যান্য,সম্পা. ২০০২)[৩২]। বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান চর্চার একটি ধারাবাহিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। বঙ্কিমের সক্ষমতা সম্পর্কে এস কে মজুমদার বলেন, 'He was well aquainted with the scientific works of the day. Communication was meagure and limited.

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

Resourses were very small but he always tried to keep up himself up-to-date'(Majumder, 2014)[56]।

উনিশ শতকের সমাজ বাস্তবতায় রচিত এ প্রবন্ধগুলি মানবজীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব স্বীকার করে অন্ধবিশ্বাস দূর করে আমাদের সত্যালোকে উন্নীত করে। প্রবন্ধ পাঠে বৈজ্ঞানিক চেতনায় সমৃদ্ধ আধুনিক জনগোষ্ঠীর সাথে লেখকের সম্পর্ক তৈরী হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর মানসিক বাস্তবতায় বিপুল পরিবর্তন আনতে শেখায় এ প্রবন্ধ। ভারতবর্ষীয় সমাজ থেকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করতে ভূমিকা রাখে। যদিও ভারতবর্ষে কোন বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। যা হয়েছিল ইউরোপে। বঙ্কিমের মতে বিজ্ঞানের কাছে ধর্মীয় জ্ঞানও পরাস্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রবাহে ধর্মপুস্তক সব ভেসে যাচ্ছে। এই জগতের সৃষ্টি সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্রের কথা নিয়েও তিনি মন্তব্য করেন। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানেরও একই মত। সবকিছুই নিয়মের অধীন। বিজ্ঞান বলে, এই সকল নিয়মের ফলেই রূপান্তর ঘটেছে এবং প্রকৃতি শাসিত হচ্ছে। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে এন সি মন্ডল বলেন, 'Getting influencesd by scientific discoveries and inventions, and ovserving human progress, bengali science writers started writings verious popular science and science fiction books in the later half of the 19th and early 20th centuries. These played a vital role in popularising science among the people. Needless to say the country at that time was under the shackles of British rules. Sahittya samrat Bankim Chandra Chattopadhays writing on science in Bengali is amazing. His book entitled `Viggan Rohossayi'is a splendid piece of work on science and science popularization. It is actually a compilation of several articles on different scientific topics. Acquiring scientific knowledge through extensive studies of the European science, he wrote all these articles in simple language, citing simple examples (Mondol, 2012)[58.]

১১.উপসংহার

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শুধু আধুনিক পুরুষ নন; নিজের কাল, নিজের সময় সাংস্কৃতিক দিক অনেক অগ্রসর আধুনিক মানুষও বটে (মজিদ, ১৯৮৯)[২৬]। একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নির্মাণের যাত্রাপথ সূচনা হয়েছে বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে। *বিজ্ঞানরহস্য* প্রবন্ধ পাঠে আমরা বিশ্বজগতের একটা সামগ্রিক চিত্র অনুধাবনের প্রাথমিক প্রয়াস পাই। অল্পকথায় বাস্তববাদী বঙ্কিমের বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা রোমাঞ্চকর ও বিস্ময়ে ভরপুর। তাঁর *বিজ্ঞান রহস্য*(১৮৭৫)[২০] প্রবন্ধগ্রন্থটি বিজ্ঞানের উপর রচিত এক অভূতপূর্ব কাজ। গ্রন্থের মোট ৯টি প্রবন্ধে মহাকাশ জগতের আশ্চর্য সৌরমন্ডল, সূর্যের গঠনপ্রকৃতি, সূর্যের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকৌশল ও বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা, আলোচনা, মহাকাশের নক্ষত্ররাজি, সমগ্র মহাকাশ জগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, ছায়াপথ, নীহারিকা, নেবুলা, প্রভৃতির পরিচয় প্রদান করেছেন। এছাড়াও এই পৃথিবীতে মানবজাতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ এবং এ সংক্রান্ত নানা মতবাদ বিশ্লেষণ সহকারে তুলে ধরেছেন। প্রোটোপ্লাজমের গঠন ও প্রাণের বিকাশ, ভূমন্ডলের অন্যতম উপাদান ধূলিকণার অস্তিত্ব, একজন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মহাকাশ ও পৃথিবীর আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছেন সুচারুরূপে।

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

সমুদ্রতরঙ্গ, শব্দতরঙ্গ, চন্দ্রপৃষ্ঠের গঠনবিন্যাস ও বৈজ্ঞানিক তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি শিক্ষিত পাঠক মহলে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার একটি মাধ্যম বলা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যে যে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা ধারা সৃষ্টি হয় তার অগ্রপথিক হিসেবে বঙ্কিম বিবেচিত। ভারতবর্ষীয় পাঠকসমাজে ধর্মীয় কুসংস্কার, অজ্ঞানতা দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তিনি। পাশ্চাত্যের প্রথম আধুনিক ফরাশি দার্শনিক রেনে দেকার্তো (১৫৯৬-১৬৫০) এ প্রসঙ্গে বলেছেন- 'মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত অজ্ঞানতা থেকে মুক্তিলাভ'(**Descartes,1984)**[48]। বাঙালি পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে বিজ্ঞানচর্চার একটি প্রবণতাও তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বঙ্কিম। বিস্তৃত অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়ের ফলে বঙ্কিম ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করেন। বিজ্ঞানের জটিলতা ও কঠিন পরিমন্ডল পরিহার করে একে আরো সরস চমকপ্রদরূপে উপস্থাপন করেছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। আর সে কারণে এটি একটি বিস্ময়কর রচনা। বঙ্কিম আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করে আমাদেরকে অন্ধকার থেকে বিজ্ঞানের জগতে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বাংলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের একটি ধারা তৈরি করেছেন তিনি। বঙ্কিমের পর ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পথকে সুগম ও সমৃদ্ধ করেছেন জগদীশ বসু (১৮০৮-১৯৩৭), আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (১৮৫৯-১৯৫৬), আচার্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), ড. মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩-১৯৫৬), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪), গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৯৫-১৯৮১) এবং আরো অনেকে। সবশেষে আমরা বলতে পারি, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানপ্রবন্ধ রচনার ঐতিহ্য তৈরির পেছনে বঙ্কিমের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়।

তথ্যনির্দেশঃ

১. আহমদ, ড. সফিউদ্দিন (২০১০) *বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক*। ঢাকা: বিশ্বসাহিত্যভবন।
২.ঘোষ, নিত্যপ্রিয় (২০১৫) *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৪০টি প্রবন্ধ*, কলকাতা: গাঙচিল প্রকাশনা।
৩.চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র (২০১৩) *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রকাশ কুমার বিশ্বাস (সম্পাদনা) ঢাকা: ঝিনুক প্রকাশনী।
৪. চট্টোপাধ্যায়,কুন্তল(২০০৯), *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, কলকাতা: রত্নাবলী।
৫. চৌধুরী, শ্রী নীরদচন্দ্র (২০১৫) *আত্মঘাতী বাঙালী*, প্রথম খন্ড, ১৬শ সং. কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।
৬. ছফা, আহমদ (২০১৩) *যদ্যপি আমার গুরু*, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।
৭. ছফা, আহমদ (২০০৮) *আহমদ ছফা রচনাবলী*(৫ম খন্ড), শতবর্ষের ফেরারি: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (সম্পাদনা) নুরুল আনোয়ার, ঢাকা: খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি।
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৪৮) *জীবনস্মৃতি*, পুমু, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।
৯.দত্ত, ভবতোষ (১৯৬১) *চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র*, কলকাতা: জিজ্ঞাসা।
১০.দাশ, সত্যনারায়ণ (১৯৭৪) *বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন সাধনা*, কলকাতা: জিজ্ঞাসা।
১১.দাশ, শ্রীশচন্দ্র (১৩৬৪),ড. বেলাল হোসেন(সম্পা.) *সাহিত্য সন্দর্শন*, ঢাকা: বর্ণবিচিত্রা।
১২.দাশগুপ্ত, শ্রী শশিভূষণ (১৩৬৭) *বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ*,৬ষ্ঠ সংস্করণ,কলিকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।
১৩.দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ (২০১২) *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র*, ড. এম মতিউর রহমান (সম্পাদক) ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।
১৪. দে, শ্রী অধীর (১৩৬৬) '*আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা*,কলকাতা: সৃষ্টি প্রকাশনী।
১৫. দে, শ্রী অধীর (১৯৮৮) '*আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা*, ১ম খন্ড, কলকাতা: উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির।
১৬. পোদ্দার, অরবিন্দ(২০১৩) *বঙ্কিম-মানস*, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা: বুকস ফেয়ার।
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবানী (২০১৩) *বঙ্কিম সাহিত্যে দ্বান্দ্বিক বিন্যাস*, কলকাতা: প্রোগ্রেসিভ পাবলিকেশন্স।

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

১৮. বসু, সুনির্মল (১৯৯৬) *বঙ্কিমচন্দ্র*, ২য় সংস্করণ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
১৯. বসু, সোমেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) (১৯৬০) *কাছের মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র*, কলকাতা: বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড।
২০. বাগল, যোগেশচন্দ্র (সম্পাদিত) (১৪১৭) *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খন্ড, ষষ্ঠদশ মুদ্রণ, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।
২১. বাগল, যোগেশ চন্দ্র (২০১৮) *ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা*, ২য় সংস্করণ, কলকাতা: বিবেকানন্দ বুক সেন্টার।
২২. বিশী, শ্রী প্রমথনাথ (২০১৪) *বঙ্কিম সরণী*, ৬ষ্ঠ সং, কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।
২৩. ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব (১৯৬০) *বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান*, কলকাতা: বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।
২৪. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (১৩৬৬) *বঙ্কিম সাহিত্য*, কলকাতা: সাহিত্য শ্রী।
২৫.মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার(২০১৪) সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি, ৪র্থ সং. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
২৬. মজিদ, মোস্তফা (সম্পাদিত)(১৯৮৯) *বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র*, ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স।
২৭. মিত্র, বিধান (২০১৯) *প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র*, ১ম প্রকাশ, ঢাকা: গ্রন্থকুটির।
২৮. মিত্র, বিধান (২০১৬) *চিন্তাবিদ বঙ্কিমচন্দ্র, প্রবন্ধের আলোকে*। বাংলাবাজার: রুক্কু শাহ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স।
২৯. মিত্র, হর প্রসাদ (১৯৬৩) *বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ*, কলকাতা: বি.সরকার এন্ড কোং।
৩০. মিত্র, গৌরী (২০০৯) *গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ব্যক্তি ও বিজ্ঞানী*, কলকাতা: গাঙচিল প্রকাশনী।
৩১. রায়, এম এন (২০১৮) *বিজ্ঞান ও দর্শন* (অনুবাদক) বদিউর রহমান, কলকাতা: নালন্দা।
৩২. রায়, অলোক; সরকার, পবিত্র; ঘোষ, অভ্র(সম্পা.) (২০০২) *দুশো বছরের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য* (প্রথম খন্ড) নতুন দিল্লি: সাহিত্য অকাদেমি।
৩৩.লাহিড়ী, আশীষ (২০১৩) *অন্য কোনো সাধনার ফল বিজ্ঞান ও বাঙালি সংস্কৃতি*। কলকাতা: পাভলভ ইনস্টিটিউট।
৩৪. লাহিড়ী, আশীষ (২০১৭) *বিজ্ঞান ও মতাদর্শ*, কলকাতা: অবভাস।
৩৫.শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ (২০১৩) *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, (সম্পা.) আব্দুল মান্নান সৈয়দ, ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।
৩৬.সরকার, বিজলি (২০০৯) *রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিমচন্দ্র: বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ*। কলকাতা: বঙ্কিম ভবন গবেষণা কেন্দ্র।
৩৭. সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র (সম্পাদিত) (১৯২২) *বঙ্কিম-প্রসঙ্গ*। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশনী।
৩৮. সিনহা, বিদিশা (সম্পাদিত) (২০১২) *বাংলা প্রবন্ধ ও সমালোচনা পাঠ*। ১ম প্রকাশ, কলকাতা: অক্ষর প্রকাশনী।
৩৯. সান্যাল, ড. ভবানী গোপাল (সম্পাদিত) (২০০৯) *বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ*। কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ।
৪০. সুফিয়ান, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ (১৯৪৯) *বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস*, ঢাকা: নওরোজ কিতাব মহল।
৪১. সৈয়দ, আব্দুল মান্নান (সম্পাদিত) (২০১৭) *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ (প্রথম খন্ড) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়*। ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।
৪২.হাই, মুহম্মদ আবদুল; আহসান, সৈয়দ আলী (২০১৫) *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)*, দ্বাদশ মুদ্রণ, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস।
৪৩.শিবাশীষ বসু, (২০২০) বঙ্কিমচন্দ্র: বস্তুবাদী থেকে ভক্তিবাদী, *চার নম্বর প্লাটফরম, ওয়েবপেইজ*। (https://www.4numberlatform.com)।
৪৪.সূর্যসেন গুপ্ত, (২০২০) নগণ্য কাব্য থেকে মহান গদ্যে উত্তরণ: রসস্রষ্টা ও প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২য়পর্ব), *ওয়েবপেজ*।
45.Abrams, M.H(1970) *A Glossary of Literary Terms*,eleventh edition,Cornell University.
46.Cuddon, J.A.(1977) *Dictionary of Literary Terms & Literary Theory*,Penguin Referance Library.
47.Chatterjee,Bhabatosh(1994) *Bankimchandra Chartterjee: Essays In Perspective*,Publication:HindSwaraj;jayGyan.(https://archive.org)
48.Descartes, Rene (1984) *The Philosophical Writings of Descartes*, Trans. John Cottingham,London.
49. Huxley, Thomas Henry (1870) *Lay Sermons, Adresses and Revisions*, London: R.clay.

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

50.Kocchar, Rajesh (2008) Cultivation of science in the 19th century Bengal, *Indian J.Phys.* Kolkata.

51.Kothari, C.R.(2004).*Research Methodology, Methods and Techniques*, New age international publications, India, New Delhi.

52.Laplace, Pierre-Simon marquis de (1796) *Exposition of solar system*,London.

53.Lyell, Charles (1863) *Geological Evidences of the Antiquity of Man*, London: J.M. Dent & Sons Ltd.

54.Levy, Hyman (1932)*The Universe of science*, New Delhi: Rupa and Co.

55.Lynd, Robert Wilson(1952) *Books and Writers*, Richard chorch (editor).

56.Majumdar, Sisir K. (2014) Bankim Chandra: First writer of popular science in Bengali: *Indian Journal of History of Science*, 49.3, p.308-310

57. Montaigne, Michael de(1892) *The Essays of Montaign*, London, Pub. David Nutt.

58. Mondol, N.C. (2012) Popular Science Writing in Bengali-Past & Present, *Indian Journal of Radio & Space Physics*, Published by CSIR-NISCAI.

59. N.Krishnaswamy, S.K. Verma and M. Nagaejan.(1992), *Modern Appiled Linguistics*, Madras:Macmillan.

60. Sen, Amiya P. (2008) *Bankim Chandra Chattopadhyay: An Intellectual Biography*. Oxford University Press.

61.Tyndall, John (1871) Dust and Disease, London: *British Medical Journal*, Vol, 1. p. 661.

62.Walker, Hugh(1915) *The English Essay and Essayists*, London:J.M.Dent & Sons Limited.

63.Young, Charles A. (1888) *Mannual of Astronomy*, Nasa-Astrophyion Data System.